Jalarka - Prabandho - Others - Shumbhu Mitro : Abhimaner Satota O Satotar Abhiman - Sobhan Gupta

জলার্ক - শম্ভু মিত্র ঃ অভিমানের সততা ও সততার অভিমান - শোভন গুপ্ত

বিজনবাস

শম্ভু মিত্রের জীবনী পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজনে আজ এই লেখা নয়, কিংবা এই লেখা তাঁর নাট্যাভিনয়ের ব্যবচ্ছেদ করার স্পর্ধিত প্রয়াসেও নয়। এই লেখা সেই মানুষকে নিয়ে যিনি মনে করতেন 'নাটকের মানুষকে সবরকম সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে এবং মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে।' তিনি বিশ্বাস করতেন না ব্যক্তি মানুষের জীবন থেকে অভিনেতা - জীবনকে পৃথক রাখার প্রচলিত পদ্ধ তি। তাঁর প্রশ্ন ছিলো, 'যদি নিজের মনের কাছে উন্মুক্ত না হই, নিজের কাছে যদি honest না হই, তাহলে কী করে ভালো শিল্পী হওয়া সম্ভব?'

এইসব গভীর প্রশ্নের সামনে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা বা মানসিক জোর না থাকার জন্য অনেক মানুষই বারবার তাঁকে টেনে এনেছেন বির্তকের আঙিনায়। বিতর্ক যাঁর ছায়াসঙ্গী, সেই শম্ভু মিত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র - পরিচালক মৃণাল সেন বলেছেন, 'শম্ভু মিত্রকে নিয়ে বহুদিন থেকেই তর্ক উঠছে নানা মহলে। তাই তাঁকে তর্কাতীত বলা সম্ভব নয়। এবং তর্কাতীত নন বলেই, আর কেউ যাই বলুন না কেন, যেমনই ভাবুন না কেন, আমি আমার সমস্ত বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে এই বিরল মানুষটিকে শ্রদ্ধা করি, সমীহ করি, ভালোবাসি। আর মনে মনে আওড়াই নীল্‌স্ বোহ্‌র্-এর সেই অসামান্য উক্তি - The truth attains a quality only when it becomes controversial.'

বাঙালির আধুনিক সংস্কৃতি - শিল্পকলার ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত মানুষ এ-যাবৎ অব্যাখ্যাত শিল্পী শম্ভু মিত্র। মৃত্যুর পরেও বিতর্ক যাঁর পিছু ছাড়লো না, সেই শম্ভু মিত্র এবং তাঁর বিজনবাসের নানারকম ব্যাখ্যা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন। কেউ বলেছেন 'অহঙ্কারী', কেউ বলেছেন 'অভিমানী', কেউ বলেছেন 'নিঃশেষিত'। তাঁর দীর্ঘদিনের নাট্যসহযোগী খালেদ চৌধুরী তাঁর বিজনবাসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আসলে একজন সৃজনশীল শিল্পী যদি অকস্মাৎ নীরব হয়ে যান, তাহলে ধরে নিতে হবে নিশ্চ য়ই কোন বিপর্যয় ঘটেছে। হয় তাঁর মনোজগতে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতায়, শারীরিক অসুস্থতা অথবা অর্থনৈতিক কারণে। যুক্তি যাই থাক, একজন শিল্পী যদি উপরোক্ত যেকোনো কারণে দীর্ঘকাল সৃষ্টিপ্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, হাজার চেষ্টা করেও তাঁকে আগের স্রোতে ফিরিয়ে আনা যাবে না, যদি না সেই শিল্পী নিজে তাঁর নিজস্ব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এগিয়ে আসেন। কথাটার অবতারণা করলাম এইজন্য যে শম্ভু মিত্র নিজেকে তাঁর সৃষ্টিক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। হতে পারে শম্ভু মিত্র পারিপার্শ্বিক কারণে বিরক্ত, হতে পারে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নিজস্ব সৃষ্ট মান আর বজায় রাখতে পারছেন না, তাই সরে গেলেন, হতে পারে তাঁর নিজের কাজ নিয়ে তুষ্ট, আর কিছু করার প্রয়োজন বোধ করছেন না। হতে পারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং কর্মক্ষেত্র থেকে দীর্ঘবিরতি হেতু তাঁর সৃজনক্রিয়ায় তীক্ষ্নতা লোপ পেয়েছে। হতে পারে তিনি ক্লান্ত অথবা এটাও ভাবা যেতে পারে যে তিনি নিঃশোষিত হয়ে গেছেন।' শম্ভু মিত্র সম্পর্কে খালেদ চৌধুরীর এই দীর্ঘ উদ্ধৃ তি পেশ করলাম একটাই কারণে যে এখানে তাঁর বিজনবাসের বিভিন্নরকম সম্ভাবনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন অথচ নাট্যমঞ্চে র স্বপ্নভঙ্গের হতাশা যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহলে তিনি ব্যক্ত করেছেন নির্দ্বিধায় তার কোনোই উল্লেখ এখানে নেই। শম্ভু মিত্রই যে তাঁকে থিয়েটারের জগতে নিয়ে এসেছেন, একথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন এবং তিনি শম্ভু মিত্রের দীর্ঘদিনের নাট্যসহযোগী;সুতরাং তাঁর তো বিজনবাসের কারণ অজানা থাকার কথা নয়। যা হোক, তাঁর নীরব থাকার ব্যাপারে এইরকম ভাবনা খালেদ চৌধুরীর একার নয়, তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও বেশকিছু বুদ্ধি জীবীর। একটা কথা খুবই চালু - শম্ভু মিত্র ইনডিভি - ড্যুয়ালিস্ট, ইগো - সর্বস্ব। এই কথা শুনলে আশ্চ র্য হই এই কারণে যে শম্ভু মিত্র যে-শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন - থিয়েটার - শিল্প, সেই শিল্প তো সঙ্গীত, চারুকলার মতো একক - নির্ভর শিল্প নয়, অনেক মানুষের সম্মিলিত ক্ষমতা - নির্ভর শিল্প, সেখানে তো কোনো একজনের পক্ষে একাকী সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত বিভাগের সুষম বিন্যাস হলে তবেই সাফল্য সম্ভব। এবং ঘটনা এই যে তিনি সর্বার্থে সফল একজন নাট্যব্যক্তিত্ব, একজন সফল নট, একজন সফল নির্দেশক, একজন সফল নাট্যশিক্ষক, একজন পরিপূর্ণ নাট্যকর্মী। এই বিশ্লেষণ ও অনুভূতি আপামর নাট্যামোদী জনসাধারণের, যাঁরা রাত জেগে বসে থাকতেন শম্ভু মিত্রের নাটকের টিকিটের লাইনে, যাঁরা পুলিশের লাঠির বাড়ি খেয়েও নড়েন না তাঁর আকর্ষণে।

'বহুরূপী'র মাধ্যমে বহু সাধারণ লোক, যাঁরা শিল্পী হয়ে আসেন নি, যাঁদের সম্বল বলতে শুধু নাটকের প্রতি ভালোবাসা, ধীরে ধীরে শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরা অনেকেই দক্ষ শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্দেশক হিসেবেও যে শম্ভু মিত্র মুক্ত-মান ছিলেন অর্থাৎ অন্য শিল্পী বা কলাকুশলীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতেন না বা সেই মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রকাশ করতেন, তারও সাক্ষ্য মেলে খালেদ চৌধুরীরই কথায়- 'শম্ভু মিত্রের সঙ্গে আমার কাজের সম্পর্ক অত্যন্ত সুখস্মৃতিকর। কেননা তাঁর নির্দেশনা কখনও বাধ্যতামূলক অথবা কোন বদ্ধ মূল ধারণা দ্বারা চালিত ছিল না। নাটক পড়া হয়েছে, মোটের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা হয়েছে। তিনি তাঁর প্রয়োজন এবং ভাবনার কথা জানিয়েছেন - বাকি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল আমার।' এই অভিজ্ঞতা শুধু খালেদ চৌধূরীর একার নয়। তাপস সেন, যিনি মঞ্চ ালোকে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তাঁর কথায়ও এর সমর্থন পাওয়া যায় - 'প্রতিটি স্তরে তাঁর মেধার কো - অপারেশন থাকত দারুণ। যেমন ভাবতে পারতেন, তেমনি ভাবাতে। অপরের ভাবনা যদি যথোপযুক্ত হতো তবে তা গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না।' এইসব নাট্যকর্মী যাঁরা দীর্ঘদিন শম্ভু মিত্রের সাথে থিয়েটার করেছেন, একসাথে ঘাম ঝরিয়েছেন বছরের পর বছর বা বলা যায় দশকের পর দশক, তাঁদের প্রযোজনাকে সার্থক করে তুলতে, তাঁরা তো তাঁকে ইগো-সর্বস্ব বা ইনডিভিড্যুয়ালিস্টি ক এই বিশেষনের মালায় অলঙ্কৃত করেন। অথচ তাঁর ইনডিভিড্যুয়ালিস্টি ক - ইগো'য় অসম্মানিত হলে তো ওঁদেরই হওয়ার কথা। ঘটনা এই যে, কাছের মানুষ অর্থাৎ যাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থিয়েটারি পরিমণ্ডলে, তাঁদের কাছ থেকে এইসব বিশ্লেষণে বিভূষিত না হয়ে তিনি বিধ্বস্ত হয়েছেন দূরের মানুষের তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্যবাণে। তাঁরা বারবার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে তাঁকে বিব্রত করার, প্রকারান্তরে বিধ্বস্ত করার। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন, কী প্রয়োজনে তাঁকেই বারবার এই আক্রমণ? শম্ভু মিত্র বেঁচে থাকার সময়ে এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর আমরা পাইনি। তিনি নীরব থেকে হয়তো অবজ্ঞা করার চেষ্টা করেছেন, হয়তো ভেবেছেন নিরুত্তর থাকলে বাক্যবাগীশরা একটা সময় রণে ভঙ্গ দেবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত। তিনি যতই মৌন অবলম্বন করেছেন, বিরুদ্ধ বাদীদের যা ছিদ্রান্বেষীদের বাক্যবাণ আরও গতিশীল হয়েছে তাতে। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং', সুতরাং ঢাক পেটাও আরো জোরে জোরে, ছড়িয়ে দাও আরো দূরে! ফলে অভিযোগ বা বিশেষণের স্তূপ ক্রমশই বাড়ছিলো । শুনলাম শাওলী মিত্র, তাঁর একমাত্র সন্তান, সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণীর কাছ থেকে, শম্ভু মিত্রের মৃত্যুর পর। শাঁওলী বাবাকে নিয়ে তাঁর স্মৃতিতর্পণে জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন এযাবৎ উত্থিত প্রশ্নগুলোর, আবার প্রশ্নও তুলে ধরেছেন প্রশ্নকারীদের সততা সম্পর্কে। এই প্রশ্নোত্তরের চাপান - উতোরে আমরাও এতকাল জমে - থাকা একতরফা অভিযোগগুলিকে বিশ্লেষণ করার একটা সুযোগ পেলাম, সুযোগ পেলাম সঠিকটাকে খোঁজবার, হৃদয় দিয়ে সমস্যাটা অনুভব করার। আমাদের কাজের সবচেয়ে বড় লাভ এটাই।

শাঁওলী বলেছেন, 'চিন্তার স্বচ্ছতা, যুক্তির অনুসন্ধান, কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতিটি ঘটনার পিছনে সন্ধান করা, সবসময়েই একটা 'কেন?'-র সম্মুখে দাঁড় করানো নিজেকে এবং অপরকে - আর তারই দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে স্বচ্ছ করে তোলবার প্রয়াস - এইটাই 'ওই শম্ভু মিত্র' নামক ব্যক্তিটির প্রধানতম গুণ অথবা দোষ। আর ওই বিশেষত্বই বোধহয় অন্য সব্বার থেকে তাঁকে এত আলাদা করে দিয়েছিল, মানুষ হিসেবে। শম্ভু মিত্রকে যে ইগো-সর্বস্ব আখ্যা দেওয়া হয় সেটা ঠিক কথা নয়। সমস্যাটা আসলে অন্যত্র। সমস্যাটা যাঁরা তর্কের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন তাঁদের নিজেদের অস্বচ্ছতায় নিহিত। সেই অস্বচ্ছতার উশুল তুলেছেন অনেকেই, খাতায় কলমে দুর্নাম রটিয়ে'। হতে পারে, শাঁওলী কন্যা বলে স্বভাবতই বাবার বৈশিষ্ট্য সমর্থন করবেন, তাঁই খোঁজ করা দরকার বৃত্তের একটু বাইরের দিকে যাঁরা আছেন তাঁদের, যাঁরা বহুরূপী ঘরানার নন অথবা যাঁরা শম্ভু মিত্র - অনুসারী হিসেবেও পরিচিত নন অথচ থিয়েটারি পরিমণ্ডলে নিজস্ব পরিচয়ে ভাস্বর। অরুণ মুখোপাধ্যায় এমনই মানুষ জগন্নাথ ও মারীচ - সংবাদ এর স্রষ্টা, 'চেতনা'র প্রতিষ্ঠাতা। বিশেষণ দেবার এই চালু খেলা নিয়ে তাঁর মত 'শম্ভু মিত্র নাট্যে ও জীবনে তাঁর উপলব্ধিমত সত্যানুসন্ধান চালিয়ে গেছেন - গতানুগতিকতার নিরাপত্তা অথবা প্রতিকূলতার টানাপোড়েন তাঁকে টলাতে পারে নি। প্রতিটি মহৎ শিল্পীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। তাঁরা এরকমটি হতে পারেন বলেই তাঁরা মহৎ। মাপা হিসেবে তাঁদের কাজ বা আচরণের পছন্দসই ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলেই আমরা কয়েকটি বিশেষণ চাপিয়ে দিই। 'দেমাকি' সবথেকে চালু বিশেষণ। জেদি, একগুঁয়ে আত্মকেন্দ্রিক এগুলোও আছে, একটু ঘুরিয়ে দেখলেই বিশেষণগুলি গুণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। জেদি বা একগুয়ে তখন আপোষহীন, লড়াকু, আত্মকেন্দ্রিক তখন আত্মানুসন্ধানী আর 'দেমাক' প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটক একবার বলেই ছিলেন দেমাকি না হয়ে উপায় কি? চারপাশের খাটো মানুষেরাই তো আমাকে লম্বা বানিয়ে দিচ্ছে।' আসল সমস্যাটার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। শুধুমাত্র দু'একজনের লেখা পড়ে বা বিশ্লেষণ শুনে কোনো সিদ্ধা ন্তে আসা সম্ভব নয়। তবে এই সমস্ত বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের নিজেদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের দিকে বারবার অঙ্গুলিসংকেত করছে। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্রেরই নিজস্ব উচ্চারণ 'আমরা এমন একটা সমাজে বাস করি যেখানে সকালে ঘুম ভাঙা থেকে আরম্ভ করে আর রাত্তিরে শুতে যাওয়া অবধি কেবলই কত বাজে কথা বলি। কত মিথ্যা ভাব প্রকাশ করি। যেটা অনুভব করছি সেটা বলিনা, চেপে রাখি।'

'এইরকম মিথ্যাচরণ যে মুহুর্মূহু করি সেটা বুঝতে পারা, সেটার সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন হওয়া এবং কষ্ট পাওয়া হলো শিল্পী হবার পথে বোধহয় প্রথম ধাপ। এবং যে যত বড় কলাশিল্পী সে বোধ হয় তত তীব্রভাবে কষ্ট পায়।'

এ বড়ো কঠিন কাজ। কঠিন দায়িত্ব। অনেক সোজা চলতি হাওয়ায় গা ভাসানো। কিন্তু আমরা যাঁরা সৎ শিল্পের কথা, সমাজ - সচেতন নাট্যকর্মের কথা বলি, তাঁরা কী করছি আজ? বিভাস চক্রবর্তীর অনুভূতিতে, 'থিয়েটারের মানুষ হিসেবে নিজেরা যেন অনেক শস্তা হয়ে গেছি, চারপাশের অনৈতিকতাকে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মতই মেনে নিয়েছি।' অথচ থিয়েটারের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। কামু বলেছেন, 'মানুষের ভেতর যে-সত্য লুকোনো থাকে, তাঁর অন্তরে যে - রহস্য থাকে, যে সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থেকেই থিয়েটারে আসা।' সুতরাং থিয়েটারের মানুষকে তো শস্তা হলে চলবে না, তাঁর তো দায়বোধ শুধু উচ্চারণে সীমাবদ্ধ করলে চলে না। তাঁর ওপর ন্যস্ত কর্তব্যকর্ম থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকা বা বিতর্কিত পরিস্থিতিতে মৌন অবলম্বন করা তাঁর ক্ষেত্রে ভণ্ডামি, কেননা 'শিল্পী হওয়ার প্রথম ধাপ তো - মানুষ হওয়া।' চারপাশের সমাজের এত অসাম্য, এত অনৈতিকতা এবং কিছুতেই সমাজ যে একটা সুছন্দে যেতে পারছে না এটা শম্ভু মিত্রকে খুবই পীড়িত করতো এবং রাশিয়ায় কমিউনিজমের ভাঙনও তাঁকে যে ব্যথিত করেছিলো তার প্রমাণ পাই তাঁর লেখায়-

'এই সমাজটা যে কী করে organise করলে আমরা একটা ভালো সমাজ পেতে পারি, যেখানে ব্যক্তিগত মানুষ আর সমষ্টিগত মানুষ একসঙ্গে এক সুছন্দে থাকতে পারে, একে অপরকে সাহায্য করবে আরও ভাল করে বাঁচার জন্য, পূর্ণতর হবার জন্য। কতরকমে মানুষ যে চেষ্টা করেছে, যে এই সমাজটাকে ঠিক করে সাজাবে, পেরে ওঠে নি। এমন কি এই শতাব্দীর মধ্যেই যে সবচেয়ে বড় একটা পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, রাশিয়াতে, সেটাও তো দেখা গেল রইল না।'

এই সুছন্দ আনার প্রয়াস নিশ্চয়ই সমস্ত সৃষ্টিশীল মানুষের মধ্যেই থাকে। আমাদের প্রয়াস থাকা উচিত যাতে যেসব সচেতন শিল্পী তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা যাতে তাঁদের সৃষ্টি পথে বাধাপ্রাপ্ত না হন সেই অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা, নিদেনপক্ষে ছিদ্রান্বেষীদের বাক্যবাণ যাতে তাঁদের এমনভাবে বিব্রত না করে যে সেটা মোকাবিলা করতে করতে তাঁরা সৃষ্টিকর্মেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, যে-নিদারুণ অভিজ্ঞতা শম্ভু মিত্রের হয়েছিলো।

'আমি বারবার মানুষের কাছ থেকে, বিশেষতঃ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে অপমানিত হয়েছি অকারণ, আর অপমানিত হতে চাইনা। দূরে সরে থাকতে চাই। বলতে চাই আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে দয়া করে আর অপমান কোর না। সাধারণ মানুষের ভালবাসা বহু পেয়েছি, নইলে এতদিন থিয়েটার করতে পারতাম না। কিন্তু সরকারী পদাধিকারী ও সাফল্যের ইঁদুর-দৌড়ে দৌড়ে বেড়ানো মানুষের কাছে ক্রমাগত বাধা পেয়েছি।'

যাত্রা হলো শুরু

১৯১৫ সালের ২২ আগস্ট ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে জন্ম হয় শম্ভু মিত্রের। খুব ছোটবেলায় মাকে হারানোর পর বাবাই তাঁকে মানুষ করেন। স্বভাব - নরম বাবার উদাসীন প্রশ্রয়ে তিনি প্রায় ছোটবেলা থেকেই নিজের খুশিমতো চলেছেন। নাটকের আকর্ষণ ছিলো স্কুল - বয়স থেকেই। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়াকালীন স্কুলের নাটকে সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়। তারপরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ে তৎকালীন বাংলা থিয়েটার নিয়মিত দেখতে দেখতে অনুভব করতে শুরু করলেন নাড়ির টান। নিয়মিত ব্যবসায়িক মঞ্চের নাটকের সাথে তাঁর যোগাযোগের সূত্রপাত 'আন্দাজ ১৫/১৬ বছর বয়সে যখন প্রথম ভাদুড়ী মশায়ের অভিনয় দেখি। সে নাট্যভিনয়ের নাম - 'দিগ্বিজয়ী'। তখনই পরপর দু'বার এই নাট্য দেখেছিলুম, কিন্তু 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের বক্তব্যই মনে হলো যেন ভিন্ন। অনেক গভীর, অনেক important.'

অভিনয়ের প্রতি তাঁর আবাল্য ঝোঁকে এবং ভাল করে নাটক করা আগ্রহে যোগ দিলেন ব্যবসায়িক থিয়েটারে। প্রথম অভিনয় রঙমহল মঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' নাটকে। তারপরে একে একে আরও বেশ কিছু নাটকে - ঘূর্ণী, রত্নদীপ, কালিন্দী, জীবনতরঙ্গ, সীতা প্রভৃতিতে অভিনয় করেন। আর এই সব নাটকে অভিনয়ের সূত্রেই ব্যবসায়িক মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে তিনি অনেক বিখ্যাত অভিনেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। এঁরা হলেন শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। কোনো মঞ্চেই তিনি বেশিদিন থাকেন নি। একের পর এক মঞ্চ বদলেছে, ফলে বদলেছে নাটক, পরিচালক ও অভিনেতাদের সঙ্গ। পাল্টানোর ফাঁকে ফাঁকেই ওইসব বিখ্যাত অভিনেতাদের সঙ্গ ও অভিনয় দেখতে দেখতে আমি শিখেছি যে অভিনয় মোটেই একমেটে নয়। ছেলে মরে গেছে, বাপের কষ্ট হয়েছে। এটা তো নাটকের সিচুয়েশন। কিন্তু সেই কষ্টের একটা ব্যক্তিগত রূপ দিতে পারাই হোল অভিনেতার সৃষ্টি। কোনও রকমে নাটকের গল্পটাকে সংলাপ আর সিচুয়েশনের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া নয়, নিজের অভিনয়ে চরিত্রের ব্যক্তিগত গল্পটাকে প্রকাশ করাই হলো অভিনেতার কাজ। তাতে অনেক কারুকার্য আসে, অনেক গভীরতা। এঁদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। তিনি শিশিরকুমার। তাঁর নাট্য প্রযোজনায়, তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণে আমি নিজে প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট অনুভব করলুম।'

অভিনয়ের দীপ্তিতে মুগ্ধ এবং সমৃদ্ধ হতে থাকলেন শম্ভু মিত্র কিন্তু মঞ্চের পরিবেশ এবং নাটকের বক্তব্য কোনোটাই তাঁর মন ভরাচ্ছিলো না। আসলে এই মঞ্চগুলো ছিলো আদ্যন্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। মালিকের সঙ্গে অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের চুক্তি হতো হয় একটা নাটকের নয়তো ছ-মাস বা এক বছরের। তাই সবসময় চেষ্টা থাকতো মালিকের মন যুগিয়ে চলার যাতে পরের বছর পুনর্বহাল হন এবং এর ফলে মঞ্চকেও কখনোই আপনার বলে মনে হতো না। আর ভালো নাটক করার বাসনা কিছুতেই এই ধরনের পরিবেশে চরিতার্থ করা সম্ভব হচ্ছিলো না, আর শুধু পরিবেশই বা কেন, নাটকের বক্তব্যও তাঁর মনের সাথে মিলছিলো না। চারপাশে যা দেখছিলেন, যেভাবে চলছিলেন বা চলতে বাধ্য হচ্ছিলেন সমাজ-জীবনে, তার প্রতিফলন কিছুই ঘটছিলো না নাটকে। চারপাশের সামাজিক চেহারা ক্রমশ বিস্ফোরক রূপ ধারণ করতে চলছিলো। সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হচ্ছিলো, বেকার সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছিলো, সারা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশই দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছিল আর সবচেয়ে ভয়াবহ চিন্তাদায়ক সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছিলো - হিন্দু মুসলিমের সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসে চিড় ধরানোর নিরন্তর চেষ্টা। অথচ থিয়েটার এসব ব্যাপারে নিরুত্তর। রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের ধারণা, এইসব ভাবনা স্ফুটনের জায়গা 'পাবলিক থিয়েটার' নয় কেননা এই ভাবনা পাবলিকে নেবে না। ওঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো যে - পরিমাণ অর্থ নাটকের পিছনে ব্যয় করা হবে তা সুদসমেদ ঘরে ফিরিয়ে আনা। ওঁদের ওপরে পরিস্কার নির্দেশ ছিলো, 'টিকিটঘর থেকে ছালায় ভরে টাকা আনতে হবে। অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলীদের মাইনে দিতে হবে, অর্থ লগ্নীকারীকে মুনাফা দিতে হবে। তা-ই ছিলো ওঁদের নাটক উপস্থাপনার উদ্দেশ্য। স্বভাবতই চারপাশে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোড়নের কোনো ছাপ ওইসব নাটকে ছিলো না। সেই সময়ের থিয়েটার প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, কলকাতায় যে থিয়েটারগুলো আছে তা বিলিতি থিয়েটারের দশম শ্রেণীর অনুকরণ। শুধু বক্তব্য নয়, ফর্মের বিচারেও তৎকালীন থিয়েটারের যে পশ্চিমী রিয়ালিস্টিক প্রথার অনুকরণ করতে গিয়ে কীরকম ব্যর্থ তা জানতে পারি শম্ভু মিত্রের কথায়। তখন নাটকগুলি লেখা হতো রিয়ালিস্টিক ধরনে অর্থাৎ নাট্যমুহূর্তগুলি তৈরি হতো স্থানের ও কালের নির্দিষ্টতার মধ্যে, স্বগতোক্তি থাকতো না - তাহলেও সংলাপগুলি খুব বাস্তবানুগ হতো না।' আর এর ফলে রিয়ালিস্টিক ধরনটা খুব কৃত্রিম মনে হতো। মঞ্চসজ্জাও বাস্তবানুগ করার চেষ্টা চলতো কিন্তু আদৌ তা সেরকম মনে হতো না। সেই কারণে পশ্চিম থেকে যে বাস্তবপ্রতিম ধরণ আমদানি করা হয়েছিলো তা শুধু নাটককে মুক্তি দিতে পারলো না তাই নয়, আমাদের দেশের স্পর্শ দিতে গিয়েও ব্যর্থ হলো। এক-তো থিয়েটারে এসেছেন তার অন্তরের রহস্য, ভেতরের সত্য উন্মোচিত করে দুর্দম প্রাণের বহ্নি জ্বালাবার জন্য। কিন্তু সে কি সম্ভব এই থিয়েটারে? 'এই থিয়েটার পরিণত হয়েছে shambles-এ, এই থিয়েটার আর সমাজের জন্য যা - যা করতে পারে, করা উচিত তার কিছু করছে না।' অগত্যা ছেড়ে দেওয়া এবং কিছু-দিনের জন্য বসে থাকা। এই সময়ে ঘটনাচক্রে দুই নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য আর বিনয় ঘোষ তাঁকে নিয়ে যান ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্গে যা গঠিত হয় ১৯৪২ সালে সোমেন চন্দর নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে। এই সংঘে থাকাকালীন দুটি নাটকে তিনি নির্দেশনা দেন ও অভিনয় করেন - একটি বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী', অন্যটি বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর পরামর্শক্রমে এই 'জবানবন্দী' নাটক হিন্দিতে 'অন্তিম অভিলাষ' নাম দিয়ে অনূদিত হয়েছিলো। পি. সি. মনে করেছিলেন দেশের পূর্ব অংশে কী ঘটছে তা জানানোর জন্য এই নাটক দেশের পশ্চিম অংশে নিয়ে গিয়ে দেখানো উচিত। ঘটনাক্রমে এই নাটক দেশের পশ্চিম অংশে বিপুল আলোড়ন তোলার পর পি. সি. যোশী শম্ভু মিত্রকে আই. পি. টি. এ. সেন্ট্রাল স্কোয়াডের থিয়েটার শাখার দায়িত্ব নিতে বলেন। ভারতীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সম্মাননীয় ও লোভনীয় এই দায়িত্ব ছেড়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর এই চলে আসার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেন, 'আমি পি. সি.-কে বলেছিলাম যে দুর্ভিক্ষকে বিষয় করে বিজন এক গভীর গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক লিখছেন এবং আমার প্রথম কর্তব্যই হলো কলকাতায় ফিরে গিয়ে নাটকটির অভিনয় করানো।' ১৯৪৪ সালের ২৭শে মার্চ 'নবান্ন'র পাণ্ডুলিপি পড়া হয় এবং এর পরে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় নির্দিষ্ট কয়েক জন পার্টি সদস্যের উপস্থিতিতে পার্টিগত ভাবে 'নবান্ন' অভিনয় করা সাব্যস্ত হয়। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ - পীড়িত মন্তব্যের হাহাকার করে করে শহরের পথে ঘাটে ঘুরে ফেরা 'মানুষ নয়, মানুষের প্রেতচ্ছায়া'র যে ভীড় যে সময় অহরহ দেখা গেছে, তার মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে বিভিন্ন গল্পে, ছবিতে বা কবিতায়।

অধিকাংশ শহরবাসীর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতো এই কীটের মতো রাস্তায় রাস্তায় মরতে থাকা মানুষের আর্তস্বর 'ফ্যান দাও বাবা'। চালের তখন আকাশ - ছোঁয়া দাম, ভাত চাইবার দুঃসাহস ছিলো না, শুধু একটু ফ্যান চাইতো। নগরীর আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতো ওই ডাক - একটু ফ্যান দেবে বাবা! বিভিন্ন সংবেদনশীল মানুষ এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের সভ্যরা শোষিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের আসল ছবি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত নিলেন - 'নবান্ন'। শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যুগ্ম নির্দেশনার এই নাটকের অভিনয় হয়। 'সারা প্রদেশ এক হয়ে মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে উঠলো।

এই চেতনা থিয়েটারকে দিলো একটি কেন্দ্র। সেখান থেকে সে সবার সঙ্গে শিল্পের ভাষায় কথা বলতে পারে। আমাদের গভীর বেদনা এবং দুঃখই হলো এই ঐক্যসূত্র। আর এথেকে জন্ম নিলো আর এক নতুন থিয়েটার যা কাঁধে তুলে নিলো এই সামাজিক দায়িত্ব।' প্রথম যে নাটকটি চেতনা আনলো নবনাট্যের তা হলো 'নবান্ন' বাংলা নাটকের মোড় ঘোরানোর ক্ষেত্রে একটি ফসল হিসাবে পরিগণিত হয় এবং 'নবান্ন'র হাত ধরেই বাংলা নাটক এক লাফে সাবালকত্বে পৌঁছে যায় এবং এরই ক্রমোন্নতিতে কিছু কিছু পরবর্তী অসাধারণ প্রযোজনার মাধ্যমে বিশ্বমানের কাছাকাছি চলে যায়। 'নবান্ন' এক ইতিহাস হয়ে গেছে তা বুঝতে গেলে বিশ্লেষণ করা দরকার নাটকের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'নবান্ন'র অভিনবত্ব কোথায়। প্রথমত নাটকটির কাঠামোই অন্যরকমের ছিলো যেখানে সাবেকি নাটকের প্রথানুযায়ী চরিত্রগুলির সংঘাত পর্যায়ক্রমিক পথ ধরে উঠে ক্রমশ চরমে পৌঁছোয়নি। নাটকটি ছিল 'পর্বে পর্বে বিবরণমূলক' যার জন্য প্রতিটা পর্বেই প্রচুর নতুন নতুন চরিত্রের আবির্ভাব হয়, যা তখনকার বিচারে অন্যপথানুযায়ী ও ভিন্ন স্বাদের। দ্বিতীয়ত নাটকটির অভিনয়রীতি ছিলো অনেক বেশি স্বাভাবিক ও হৃদয়স্পর্শী। এই রীতির মধ্য দিয়ে অনেক গভীর কাব্যমুহূর্তের সৃষ্টি হতো। 'নবান্ন'র অভিনয় প্রমাণ করলো যে অভিনেতার পক্ষে কবিতার কণামাত্র বিসর্জন না দিয়ে, একটুও কৃত্রিম না হয়ে সবাক ও আবেগময় হওয়া সম্ভব। শম্ভু মিত্রের মতো 'নবান্নের নাট্যাভিনয়ে কাব্য ছিলো, আবেগের কাব্য, মানুষের নিঃসহায়তার কাব্য, তার ভালবাসার কাব্য।' শুধু তাই নয়, এর অভিনয় সম্পর্কে শোনা যায়, দৃশ্য পরিবর্তনের সময় মঞ্চ ঘোরার সাথে সাথে অন্ধকারের মধ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের 'বাবা, একটু ফ্যান দ্যাও, বাবা' আর্তনাদ যাঁরা শুনেছেন তারা ভুলতে পারেন নি। দিনের প্রখর আলোতেও যেন তাঁদের কানে ওই স্বরের প্রতিধ্বনি তাঁরা শুনতে পেতেন, এমনই মর্মস্পর্শী অভিনয়।

'নবান্ন' নাটকের ভাষাও তৎকালীন থিয়েটারের পাশাপাশি এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মঞ্চে এই প্রথম সরাসরি আঞ্চলিক ভাষা, কখনও কখনও অমার্জিত ভাষা ব্যবহৃত হলো। থিয়েটারের চরিত্রের ভাষায় স্বাদবদলও নবান্নের আকর্ষণের একটা অন্যতম কারণ।

শুধু অভিনয় বা বক্তব্যের দিক থেকে নয়, 'নবান্ন'র মঞ্চ সজ্জার মধ্যেও বেশ কিছু অভিনবত্ব ছিলো যা শুধু সেদিনের মানুষকেই মুগ্ধ করেনি, আমরাও এতদিন পরে সেই অনাড়ম্বরতার কথা ভাবলে (এখনকার বহু মঞ্চ সফল নাটকের কথা মনে রেখে) চমৎকৃত হই। শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভোলানোর রীতি শম্ভু মিত্রের নাট্যধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'নবান্ন'র আগে সেই সময়ের নাটকে মঞ্চ সজ্জা কেমন হতো সে ব্যাপারটা জানা না থাকলে 'নবান্ন'র মঞ্চ সজ্জার অভিনবত্ব বোঝা অসম্ভব। আগেকার নাটকে মঞ্চ সজ্জায় একটা বাস্তবতা আনার চেষ্টা চলতো, যেমন সে আমলের নাটকে দেয়াল বা দরজা বা জানালা ফ্রেমে আঁটা কাপড়ের ওপর আঁকা হতো, তার ফলে এই চিত্রিত দেয়ালে কখনোই দেয়ালের ঘনত্ব থাকতো না এবং দরজা, জানালাকেও পুরু বা ভারী মনে হতো না। এই কারণে স্বাভাবিক ভাবেই দরজা, জানালা বা দেয়াল কোনোটাই বাস্তব মনে হতো না। কিন্তু 'নবান্ন'র ভিন্নতা অন্য জায়গায়। একই দৃশ্যে দুটি স্থানগত ভিন্নতা বোঝাবার জন্য দুটি ভিন্নস্তরের প্রয়োগ হয়েছিলো, আবার একই সঙ্গে দুটি চরিত্রের বোঝাবার কাজেও স্তর দুটির ব্যবহার হয়েছিল। যেমন মঞ্চের সুম্মুখভাগে যাঁরা থাকতেন তাঁরা এক একটি সম্পূর্ণ চরিত্র আর পিছন - ভাগে যাঁরা থাকতেন তাঁরা জনতার অংশ, কোনো পৃথক ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে নয়। নবান্নে প্রথম চটের পর্দা ব্যবহৃত হয় দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজনে। আসলে ভাবনাটা চটের পর্দার ছিলো না, বাসনা ছিলো ভেলভেটের কালো পুরু পর্দার, যাতে আলো প্রতিফলিত তো হয়ই না, বরঞ্চ শোষিত হয়। কিন্তু সমস্যা সেই সাধ ও সাধ্যের। অবশেষে চিন্তার নিরসন ঘটালেন মহর্ষি। 'আমরা গরীব দেশের লোক। আমাদের ভেলভেট নেই কিন্তু চট আছে।' এবং অবশ্যই ছিলো রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। 'তাঁর অনেক অনুষ্ঠান নাকি শুধু পর্দা ঝুলিয়েই হতো। 'তপতী' নাটকের শুরুতে দৃশ্য - সজ্জা সম্পর্কে তাঁর লেখা তো পড়া ছিল বটেই।' সুতরাং লাগানো হলো চটের পর্দা এবং তাতেই খুলে গেলো বাংলা নাট্যমঞ্চ সজ্জার একটা নতুন দিক।

'নবান্ন'র সাফল্যের পিছনে রয়েছে আরেকটি বড় কারণ। সমাজে কোনো ঘটনায় একটা আলোড়ন তৈরি হলে সেই আলোড়নের অনুভব যে-গান, লেখা বা অভিনয়ের মধ্যে থাকে সেটা মনের গভীরতাকে স্পর্শ করে। নবান্নের সাফল্য বিষয়ে শম্ভু মিত্রের মত 'বাংলাদেশের পঞ্চাশের মন্বন্তরে, সমাজের মানসকেন্দ্রে, যেখানে ন্যায় - অন্যায় বোধ বিধৃত, সেখানে যে গভীর ধিক্কার আর বেদনাবোধ জেগেছিল, অজান্তে আমরা সেই কেন্দ্র থেকে কথা বলেছি। তাই মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো জাগাতে পেরেছি।

তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিও নবান্নকে দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছিলো। অমৃতবাজার বললো, 'আমাদের ধারণা বাংলায় নবনাট্য আন্দোলনের এটাই সম্ভবত প্রথম পদধ্বনি।' আনন্দবাজারের মতো 'প্রয়োজনা, পরিচালনা ও অভিনয়রীতিতে নবান্ন এক প্রাণখোলা অভিজ্ঞতা'। এবং যুগান্তরের মন্তব্য 'এতদিন পেশাদারী নাটক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা'। এবং যুগান্তরের মন্তব্য 'এতদিন 'এতদিন পেশাদারী জীবন থেকে নেওয়া চরিত্রগুলোকে এমন জীবন্ত করে তুলেছে।'

'নবান্ন'র অভাবনীয় সাফল্যের পর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেন্ট্রাল স্কোয়াডের ডাকে আই. পি. টি.-এর ব্যানারে 'ধরতিকে লাল' ছবিতে কাজ করার জন্য শম্ভু মিত্রকে যেতে হয়। বিজন ভট্টাচার্যের ইতিহাস - সৃষ্টিকারী 'নবান্ন' ও 'জবানবন্দী' এবং কৃষণ চন্দরের 'অন্নদাতা' অবলম্বনে তৈরি হয় এই ছবি। এই ছবি পরিচালনা করেছিলেন খাজা আহমেদ আব্বাস আর এই ছবির সূত্রেই প্রথম চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেন রবিশঙ্কর। শম্ভু মিত্র এই ছবিতে অভিনয় করা ছাড়াও সহ-নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সাথে এই ছবিতে আর যেসব প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বরা অভিনয় করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বলরাজ সাহনী, রশিদ খান, ডেভিড এবং তৃপ্তি মিত্র। এই ছবিতেও শম্ভু মিত্রের অভিনয় যে জনচিত্তে বিপুল পরিমাণে নাড়া দিয়েছিলো, তা জানতে পারি আর এক প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব হাবিব তনবীরের অভিজ্ঞতায়, 'ধরতিকে লাল' ছবিতে শম্ভু মিত্রের অভিনয় হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই দৃশ্য আমার সময়কার মানুষদের এখনও মনে আছে যখন শম্ভু মিত্র নিজের হাতে মাটি নিয়ে কম্পিত গলায় একেবারেই এক নিজস্ব ভঙ্গীতে বলছেন 'এই পৃথিবী সোনা ফলাবে'।' 'ধরতিকে লাল' হয়তো এমন কিছু নান্দনিক উৎকর্ষের পরিচয় রাখেনি, তবে গণনাট্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত এই ছবি গণআন্দোলনকেই আরো সমৃদ্ধ করেছিলো। আর সেই কারণেই 'ধরতিকে লাল' এর সফলতার পরেই গণনাট্য সংঘ আর একটি ওই ধরনের ছবির পরিকল্পনা করে। ওই ছবির ব্যাপারে শম্ভু মিত্রের স্মৃতি

'শ্রী পি. সি. যোশীর আমন্ত্রণে আমি বোম্বে গিয়েছিলুম। ধরতিকে লাল-এর মতো আর একটা ছবি করতে।... কিন্তু পার্টির ভিতরকার দ্বন্দ্বে শ্রী যোশী অপসারিত হন।' পি. সি. অপসারিত হবার পর গণনাট্য সংঘে শিল্পীদের ওপর পার্টির নিয়ন্ত্রণে ফাঁস ক্রমশই দৃঢ় হতে থাকে। সৃষ্টিশীল শিল্পীদের স্বভাবতই সেই পরিবেশ খুবই অসহনীয় লাগতে থাকে, যার বিবরণ আমরা পাই তখনকার গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য সেতার - শিল্পী রবিশঙ্করের অভিজ্ঞতায়-

'প্রথম প্রথম স্কোয়াডে এসে পার্টির তখানি উপস্থিতি বোধ করি নি - ক্রমে ক্রমে পার্টির নানারকম ফরমায়েশ শুরু করল। যেখানটার অসুবিধা দেখা দিল তা হলো ওদের পার্টির হুকুম অর্ডার নিয়ে শিল্পের দিকটায় আগ্রহ যেন কমতে থাকল। কোনও অ্যাবস্ট্রাকশন, কোনও পিওর আর্টিস্টিক কিছু অবশ্যই ওদের সূচি - বহির্ভূত ছিল।'

আর শম্ভু মিত্রের কথায় '-যারা শিল্পকলা সম্পর্কে আদৌ কিছু ভাবে নি, যাদের শিল্প সম্পর্কে কোন বোধ নেই, অথচ কিছু মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের বুকনি জানা আছে, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারা আমার ক্ষমতায় কুলোত না।'

মন না মিললেও দেহ মেলাতে হবে - এ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না, কেননা তিনি চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা থিয়েটার, যে থিয়েটারের কাজের মধ্য দিয়ে বিম্বিত হবে গোটা সমাজটা। তাঁর বিশ্বাসে 'A nation is known by its theatre।' সারা দেশের শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় প্রতিভাধর শিল্পীরা নিজেদের প্রাণের টানে মিলিত হয়েছিলো, একত্রিত হয়েছিলো গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, বলরাজ সাহনী, খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস, সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, শোভা সেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তারকা - খচিত সেই গণনাট্য সংঘ একটা সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক ধারাকে শাসনের ক্ষমতা রাখতো। আসলে সেই সময় ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন যতটা সমৃদ্ধ ছিলো, তার তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও শক্তিমান ছিলো ফ্রন্টের নেতৃত্ব। এই ফ্রন্টে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন বিশ্বমানের যার ফলে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের লোকদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না রাজনৈতিক নেতাদের কথাকে বেদবাক্য বলে মনে করার। আমাদের দুর্ভাগ্যকে আরও বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়ে গণনাট্য সংঘ ছাড়লেন শম্ভু মিত্র। 'সংগঠনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বড় ফাঁকি ছিলো। নইলে এত তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল কেন? নবান্নর সময়ে যত লোক একত্রিত হয়েছিলেন তার মধ্যে বেশ কিছু লোক দেশে শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তবু আরও নাট্য সৃষ্টি হলো না কেন? এক নবান্ন নাটকেই এর উত্থান ও পতন ধৃত হোল কেন? এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কিছু বিচার বিবেচনা হয়তো প্রয়োজন ছিল - যদি কোনও দিন তার প্রয়োজন মনে করে করবে।

<u>বহুরূপী</u>

গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার এক অনিশ্চিত সমুদ্রে ভেলা ভাসানো। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার মধ্যে কম্পমান দীপকে দু'হাতের মধ্যে আড়াল করে যাত্রা শুরু এক স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। স্বপ্ন থিয়েটারে নিবেদিত একদল মানুষের, যাঁদের সবাই মিলে একটাই পরিচয় এবং 'যেখানে আত্মোপলব্ধি আসতে পারে শুধুমাত্র থিয়েটারের মধ্য দিয়ে'। কিন্তু বড় কঠিন এই কাজ, বহু বাধা এই পথে। সম্ভব - অসম্ভবের দোলাচলে যখন দুলছিলো তখন ভরসা যোগালেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, 'What is the use of Eating our hearts out? আমরা যেমন করে পারি, যেটা ভালো মনে করি, করতে শুরু করে দিই।' আবার শুরু হলো যাত্রা। প্রথমে 'অশোক মজুমদার নাট্য সম্প্রদায়' ও পরে মহর্ষিরই দেওয়া 'বহুরূপী' নামে।

'নবান্ন' - পরবর্তী সময়ে বহুরূপী প্রযোজনাগুলির বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একথা বলা যায় যে শম্ভু মিত্রের উদ্দেশ্য ছিলো সমাজের বিভিন্ন অংশের বাস্তব চিত্রায়ণ। এ প্রযোজনাগুলির শৈল্পিক মান সম্পর্কে থিয়েটার - জগতের আর এক প্রবাদপুরুষ উৎপল দত্ত ও প্রশংসামুখর ছিলেন, 'গণনাট্য আন্দোলন থেকে এলেই হল না, নাট্য প্রযোজনা বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে পেশাদারী সূক্ষ্মতারও প্রয়োজন আছে - এই সত্যটি শম্ভু মিত্রই সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।' শুধু তাই নয়, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে তিনি বুঝিয়েও দিলেন গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের ওপর রাজনৈতিক চাপ শিল্পসৃষ্টির অন্তরায় ছিলো -- 'নাটক না শিখে না বুঝে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়লেই হলো না। একটা নাটক মঞ্চ স্থ করার পেছনে রয়েছে বিরাট দায়িত্ব, অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার।'

'পথিক', 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া', ও 'বিভাব'-এর পর থেকেই শুরু হলো শম্ভু মিত্র তথা বহুরূপীর রবীন্দ্রনাটক। ১৯৫১ সালে রবীন্দ্রনাথের বহুবিতর্কিত, বহুসমালোচিত 'চার অধ্যায়'-এর নাট্যরূপ মঞ্চ স্থ করলেন তিনি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু শহীদের রক্ত ঝরেছে আর রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে সশস্ত্র সংগ্রামীদের সম্পর্কেই এমন মন্তব্য করেছেন যা শম্ভু মিত্রের মতে 'আমাদের গভীর আকাঙ্ক্ষার গণতন্ত্র সম্পর্কে দৈববাণীসদৃশ', যা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো 'চার অধ্যায়'কে পরবর্তী নাটক হিসাবে বাছতে। কী ছিলো সেই দৈববাণী?

'প্রেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকা। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালোভের গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের কখন নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ...মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পারো। তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল, মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীবন মনে করলেই সত্য মনে করা হয়।'

'চার অধ্যায়' করার সূত্রে এই সময় তাঁর গণনাট্য সংঘের একদা সাথী ও কমিউনিস্ট বন্ধুদের অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শের স্বার্থে কিছুতেই 'চার অধ্যায়'কে মানতে পারেন নি। কিন্তু বহুদিন পরে যখন প্রমাণ হয় যে পার্টি সবক্ষেত্রে অভ্রান্ত ছিলো না সেদিন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধ্যু গণনাট্য সংঘের একদা সাথী চিন্মোহন সেহানবিশ মেনেছিলেন, 'সঠিক সময়েই শম্ভু চান্দর অধ্যায়টা করেছিল - আজকে বুঝতে পারছি।' পঞ্চাশের গোড়ায় এ আলোড়ন-তোলা প্রযোজনা এর পরেও বারবার পুনর্নির্মিত হয়েছে ছয়, সাত এবং আটের দশকে। প্রথমদিকে অতীনের চরিত্রে অভিনয় করতেন সবিতাব্রত দত্ত, পরে বাহান্ন সাল থেকেই শম্ভু মিত্র ওই চরিত্রে অভিনয় করেন। তৃপ্তি মিত্র অবশ্য আগাগোড়াই এলার চরিত্রে অভিনয় করেন। শেষবার যখন ক্যান্সার হাসপাতালের সাহায্যার্থে অভিনয় হয় তখন শম্ভু মিত্রের বয়স সাতষট্টি। 'চার অধ্যায়' থেকেই বহুরূপী 'রবীন্দ্রনাথ - অভিনয়ক্ষম' প্রমাণ করার যাত্রা শুরু হয়, তা তুঙ্গে ওঠে 'রক্তকরবী'তে। সংলাপের ভাষায় 'চার অধ্যায়' দর্শকের কাছে সহজতর হয়েছিলো 'রক্তকরবী' বা 'রাজার তুলনায়। হয়তো শহুরে সংলাপ বলেই এটা সম্ভব হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনেকটা হিমশৈলের মতো। একটুখানি চূড়া উঠে আছে ভাষার মাধ্যমে, ভাবের গভীরতা অতলে। যত ডুব তত রস!

আবার প্রেক্ষাপট বদল। রবীন্দ্রনাথের পর এবার ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপ্‌ল' এর ভাষান্তর 'দশচক্র'। একমাত্র রাশিয়ায় এই নাটক খোদ স্তানিস্লাভস্কির প্রযোজনায় বহুসমাদৃত, যদিও অন্য কোথাও এই নাটক খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি। আবার সমালোচনার ঢেউ উঠলো এই নাটক নির্বাচন নিয়ে। ১৯৫২ সালে ভারত যখন প্রজাতন্ত্রী দেশ হিসাবে ঘোষিত হচ্ছে, তখন সমষ্টির বিপরীতে একক মানুষের জয়ধ্বনির এই নাটক কেন? শম্ভু মিত্রের যুক্তিতে 'ডেমোক্রেসি বা প্রজাতন্ত্র যদি সাচ্চা না থাকে তা তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে ভরাডুবির অতলে। এ নাটক যেন তাই এক সতর্কবাণী - সংখ্যাধিক্যই শেষ মাপকাঠি নয়।' যুক্তি যাই থাক, প্রযোজনা হিসাবে আবারও সফল। 'দশচক্রে' শম্ভু মিত্র অভিনয় করেন আদর্শবাদী ডাক্তার পূর্ণেন্দু গুহের চরিত্রে। এই নাটকে মঞ্চে প্রপার্টিকে আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। সে সম্পর্কে মুগ্ধ মারাঠি মঞ্চে র বিশিষ্ট অভিনেতা সফি ইনামদার - 'দশচক্রে ওঁর পরিচালন - দক্ষতা অবিস্মরণীয়। মনে আছে বিশেষ করে সেই দৃশ্য যেখানে ডাঃ ষ্টকম্যানকে (ডাঃ গুহ) পাথর ছোঁড়া হচ্ছে। ড্রইংরুমের টিপয়ের ওপর ছিল পাথরের এক স্তূপ। ওঁর শ্বশুর এসে একটা চিঠি দিলেন। শম্ভুদা সেই চিঠিটা রাখলেন পাথরের স্তূপের ওপ। তারপর চিঠির ওপর রাখলেন আর একটি পাথর। দর্শকের কাছে চিঠিটাও পাথর হয়ে গেল।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সত্যজিৎ রায়ও ইব্‌সেনের এই নাটক থেকেই ছবি করেন 'গণশত্রু'। তাঁর ছবির শেষ দৃশ্যে নেপথ্যে শোনা যায় 'অশোক গুপ্ত জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে একটি মিছিল এগিয়ে আসে আর ক্রমশ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সৌমিত্রের মুখ। একক মানুষের বিশ্বাসের জোর ছাড়াও, তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন পাশাপাশি অন্য মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থার প্রতি। 'দশচক্র' নাটকে কিন্তু শম্ভু মিত্র বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন ইব্‌সেনের দর্শনে -'নিজস্ব মতামত আর বিশ্বাসে অটল মানুষই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ।' তাঁর এই ভাবনার সপক্ষে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, 'সমগ্র সমাজ, মানবধর্মের প্রতি কর্তব্যটা সদা ব্যষ্টির হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। বরং কদাচিৎ একা একটা মানুষই সত্যদ্রষ্টা হয়ে ওঠে। যেমন ভাবুন ডারউইনের কথা কিংবা মার্কস বা ফ্রয়েড এর কথা।'

এরপর ১৯৫৪ সালে বাংলা নাট্যমঞ্চে র সর্বোচ্চ ধাপে আরোহন - 'রক্তকরবী'। আবার রবীন্দ্রনাথ, আবার ঝুঁকি, আবারও সাফল্য। অথচ তার আগে পেশাদারি থিয়েটারে রবীন্দ্রনাট্য কখনোই পপুলার হয়ে ওঠে নি। মহাকবি গিরীশচন্দ্র 'নৌকাডুবি'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং শিশির ভাদুড়ীও মঞ্চ স্থ করেছিলেন রবীন্দ্রনাটক, কিন্তু কেউই সফল হন নি। আর তার ফলে একটা ধারণা চালু হয়ে গিয়েছিলো যে রবীন্দ্রনাট্য অভিনয়যোগ্য নয়, রবীন্দ্রনাট্যের সংলাপও জীবন থেকে আহরিত নয়। তবু তিনি রবীন্দ্রনাটকই নির্বাচন করলেন কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি শুধু পাঠ্য হিসাবেই নয়, তার থেকে ভালো থিয়েটারও যে হতে পারে তা প্রমাণ করা। রবীন্দ্রনাথের সংলাপের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ্যে যে বিরূপ মনোভাব, সে ব্যাপারেও তিনি স্পষ্ট -'তাঁর লিখিত সংলাপ অত্যন্ত জীবন্ত ও দ্যুতিসম্পন্ন, এবং বিস্ময়করভাবে সূক্ষ্মতামণ্ডিত - যে সূক্ষ্মতা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকমনে নাটকীয় অভিঘাত জাগাতে সক্ষম।' তিনি বিশ্বাস করতেন বাস্তব জগতের বাস্তব সমস্যাকে ভিত্তি করেই এই নাটক। 'রক্তকরবী' সম্পর্কে - রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই নাটকটি সত্যমূলক এবং ঘটনা যা ঘটছে তা কবির জ্ঞান বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য।' শম্ভু মিত্রের কাছে রক্তকরবী নির্বাচন করার মূলে ছিলো এই ভাবনা যে 'রক্তকরবী' 'আধুনিক জীবনের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত এবং সর্বোপরি এটা অভিনেতা ও নির্দেশকদের লুব্ধ করার মত নাটক।'

শম্ভু মিত্রের আগে রবীন্দ্রনাটক কারুর পক্ষেই মঞ্চ সফল করে তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কেন? 'নবান্ন' - পূর্ববর্তী থিয়েটার - রীতি অনেকাংশে দায়ী বলে চিহ্নিত হতে পারে কেননা ওই থিয়েটার - রীতি মূলত পশ্চি মী থিয়েটার - অনুসারী ছিলো। ঘটনা এই, সেই রীতিতে রবীন্দ্রনাটক সফল করা যায় না। প্রয়োজন ছিলো একটা ভারতীয় নাট্যরীতির, যা বহুলাংশে সম্ভব করেছিলো 'নবান্ন'-প্রবর্তিত অভিনয়রীতি। অন্তত শম্ভু মিত্র তাই মনে করতেন।

'বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরীশ ঘোষের নাটকের পর রবীন্দ্রনাটককে মঞ্চ সফল প্রমাণ করে শম্ভু মিত্রই বাংলা নাটকের অর্গলমুক্তি ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাটকের ঐতিহ্যকে শম্ভু মিত্র বাংলায় ফিরিয়ে আনতে পারায়, উৎপল দত্তের মতে, 'বিস্মিত হয়ে বাংলার মানুষ লক্ষ্য করল যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে মুন্সিয়ানা, ব্যঞ্জনা, তার সমকক্ষ নাটক আজও সৃষ্টি হয় নি।' উৎপল দত্তের এই বিশ্লেষণ 'রক্তকরবী'র সংলাপের কালজয়িতার কথাই সমর্থন করে এবং এই পরিচয় নাটকটির প্রতিটি সংলাপেই পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে 'রক্তকরবী'র প্রতিটি সংলাপের তাৎপর্যময়তা রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী দূরদৃষ্টির বার্তাই বহন করে এবং এই সংলাপের এক অতলান্ত বিশ্লেষণ করেছেন শম্ভু মিত্র তাঁর 'নাটক রক্তকরবী' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ পড়লে বোঝা যায় কেন 'রক্তকরবী' তাঁর কাছে শুধু নাটকই ছিলো না বা কেনই বা তিনি বলেছিলেন 'নাট্যভারতীয় আদর্শ হিসাবে রক্তকরবীই সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি।'

'রক্তকরবী'তে রাজা বলেছেন, 'বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে, সেই ছন্দ আছে নন্দিনীর মধ্যে।' এই কথার সরাসরি কোনো অর্থ খুঁজে বার করা খুবই কঠিন। কেউ কেউ 'কবিসুলভ অত্যুক্তি' বলে এড়িয়েও যেব্দতে পারেন। শম্ভু মিত্রের বিশ্লেষণে, 'এ কথার অর্থ তখনও ভাল করে বুঝিনি। কিন্তু যখন মানুষ ভাল করে বুঝল যে আমাদের eco-system-এর মধ্যেই আমাদের মানিয়ে চলতে হবে, তখনই বুঝল যে প্রকৃতির নাচের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়েই আমাদের সার্তকতা খুঁজে পেতে হবে। অর্বাচীনের মতো শুধু প্রকৃতিকে লুঠ করতে চাইলে কেবল নিজেদেরই বিনষ্ট করা হবে।' আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক নন্দিনীকে বলেছেন, 'আমাদের সর্দারকে টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।' গায়ের জোর চাই অর্থাৎ সশস্ত্র লড়াই-এর প্রয়োজন। শম্ভু মিত্র বিশ্লেষণ করেন, 'যে কোন তীক্ষ্ণ ও অনুভবসম্পন্ন কথাশিল্পীই তো এইভাবে অজস্র ইঙ্গিতে তৎকালীন বাস্তবের গভীর কথাটা প্রকাশ করেন তাঁর সৃষ্টিতে।' 'রক্তকরবী'র সংলাপকে যদি আমরা আমাদের বাস্তব পরিবেশের সাথে মিলিয়ে দেখতে যাই তাহলে যেন সংলাপগুলি দুটো স্তরের বলে মনে হয়। একরকম যেন আমাদের বাস্তবকে কাছ থেকে দেখা আর একটিতে রূপকের আভাস। 'সত্যমূলক' এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের এইরকম একাধিক স্তরে একই সাব্দথে বিচরণ - ক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করে। শম্ভু মিত্রের মতে, 'যে-সাহিত্য, যে-অভিনয়, যে-সঙ্গীত আমাদের সত্তার নানা গহন স্তরকেক বিদ্যুৎগতি স্পর্শকের মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাদের জাগিয়ে তোলে - মনে হয় অনেক চিন্তাকে অনেক জটিল অনুভবকে যেন ইঙ্গিতে জাগিয়ে দিয়ে গেল - সেই সব শিল্পকলাকেই আমরা মহৎ মনে করি। আমাদের গভীর অন্তরঙ্গ বলে প্রিয় মনে করি।' 'রক্তকরবী'র সংলাপের আপাতকঠিন বর্ণের আড়ালে অসাধারণ ইঙ্গিতবাহী বক্তব্যের বন্ধনমুক্তি ঘটেছিলো শম্ভু মিত্রের যাদুকাঠির স্পর্শে। আর তাতেই এই প্রযোজনা সাফল্যের শিখরে উঠতে পেরেছিলো। 'রক্তকরবী'র সংলাপে বলা হয় ানেক কম, বোঝানো হয় অনেক বেশি। বহুরূপীর এই প্রযোজনার ইর্ষাদায়ক সফলতার পিছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অবশ্যই এই যে, এই নাটক মানুষের মনের গভীরকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পেরেছিলো।

'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য নাটকের মতোই দৃশ্যসজ্জার কোনো উল্লেখ রাখেন নি। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'শেক্স্পীয়ারও তেন্দ্বা অত বিস্তারিতভাবে লিখে দেন নি। যাঁরা আমাদের নাটক ভালবাসে, তাঁদেরই বা অত বোকা মনে করা কেন! তাঁরাও তো নিজেরা বুঝে অনেকটা নিজেরাই সৃষ্টি করে নেবে।' সুতরাং এ নাটকের দৃশ্যসজ্জা প্রস্তুত করতেও শম্ভু মিত্র এবং খালেদ চৌধুরীকে তাঁদের উদ্ভাবনীক্ষমতান্দর, সৃজনশীলতার শিখরে আরোহণ করতে হয়েছিলো। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁক ছবি থেকে তাঁদের প্রথম সিঁড়ির ভাবনা, কেননা তংদের বাবনায় 'যক্ষপুরীতে ওপরতলার মানুষেরা তাকে ওপরে, নীচের তলে বা মেঝেতে বসে বা চলাফেরা করে চন্দ্রা ফাগুলালরা, দুটেন্দ্বা ধাপ ওপরে নন্দিনী বসে রাজার দরজার সামনে আর ওপরের ধাপে সর্দার, গোঁসাই, অধ্যাপক, মেজ সর্দার, মোড়ল প্রভৃতিরা। নন্দিনীর অবশ্য সব ধাপেই যাতায়াত ছিলো এই দৃশ্যসজ্জায়। এর ফলে পুরো নাটকটাই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছিলো সাধারণ দর্শকের কাছে।

বহুরূপীর প্রযোজনার এই সর্বস্তরীয় অসাধারণত্ব বজায় ছিলো পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ, পোশাক নির্বাচন নিয়ে সমাজের এক বিশেষ অংশ থেকে বহু বিরূপ সমালোচনা হওয়ায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের পরামর্শে এবং তাঁরই সাথে শম্ভু মিত্র ও খালেদ চৌধুরী শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর শরণাপন্ন হন। তাঁরা প্রধানত আলোচনা করেন রাজার পোশাক নিয়েই কারণ বিতর্কের মূল কারণ ছিলো ওটাই। সমস্ত পোশাকের বিবরণ এবং ব্যাখ্যা শুনে শিল্পাচার্য পরামর্শ দেন রাজার পোশাকে বজ্রের চিহ্নিত বদলে 'toobhed wheel' লাগাতে কেননা এই রাজাতো স্বাভাবিক রাজা নয়, 'এ হলো আজকের মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি।'

'রক্তকরবী'র ইতিহাস - সৃষ্টিকারী সফলতার পিছনে বহুরূপীর অসাধারণ সম্পেলক অভিনয়ের অবদানও বড় কম নয়। 'নন্দিনী' তৃপ্ত মিত্র তুলনাহীনা। মচে তাঁর অনায়াস সচলতার তুলনা করা যায় উচ্ছলা ঝর্নার সন্দাথে। অধ্যাপকের ভূমিকায় কমার রায় এতই স্বচ্ছন্দ ছিলেন যে তাঁদের চরিত্রকে তাঁদের থেকে পৃথক বলে মনে হতো না। আবারও শম্ভু মিত্র - নেপথ্যের রাজা, শুধু কণ্ঠস্বরের ওঠানামায় কী অবলীলায় বুঝিয়েছিলেন চরিত্রের খুঁটিনাটি। শুধু গলার স্বর প্রক্ষেপণের মুগ্ধ বোম্বের নামী অভিনেতা, মারাঠি থিয়েটারের অন্যতম স্তম্ভ অমল পালেকার বলেন, 'এ যেন কে ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পীর গান শোনার অভিজ্ঞতা। সুরের প্রতিটি পর্দা যেন তাঁর কণ্ঠে অবিগত।'

এইসব প্রযোজনা - বৈশিষ্ট্য অবশ্যই 'রক্তকরবী'কে সার্থকতা দিয়ে এগিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু আসল কারণ অবশ্যই নিহিত ছিলো 'রক্তকরবী'র 'কাব্যিক মনোভাষ্কের ধোঁয়ায় অন্ধ না হয়ে' সাধারণ লোকের এর মধ্যে 'জীবন্ত মানবিক হাসি, ঠাট্টা, দুঃখ দেখতে পাওয়া'। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন শম্ভু মিত্র সংলাপ বলার ধরণটাই পাল্টে দেওয়ায়, সংলাপ অত্যন্ত খোলামেলাবাবে অর্থাৎ পুরো হৃদয় দিয়ে বলে। রবীন্দ্রনাছে পৌঁছবার সূত্র হিসাবে তাঁর অনুভব-

'রবীন্দ্রনাথের সংলাপ বুদ্ধি বর্জিত কাব্যিক-কাব্যিক সুরে যদি পড়ি, তাহলে চরিত্রকে বাস্তবভাবে ফোটাতে শেখার পরই এই বাস্তবাতিরিক্ত প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত করতে হয়। সত্য হয়ে উঠতে শিখতে হয়ত। এই বোধহয় মোটামুটি একটা বিবরণ। রবীন্দ্রনাথে পৌঁছাবার।'

শম্ভু মিত্রের অনুভব - সৃজিত 'রক্তকরবী'র ওই তুঙ্গস্পর্শী প্রযোজনা আলোড়িত করেছিলো সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল, তারই আভাস পাই বিভিন্ন শিল্পী সাহিত্যিকের লেখায়। হাবিব তনবীরের মতে, 'যদি রবীন্দ্রনাথ নিজে শম্ভু মিত্র নির্দেশিত রক্তকরবী দেখতে, তাহলে তিনিও যে খুশী হতেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চি ত।' উৎ পল দত্ত, থিয়েটারে মঞ্চ সফল নয়' এই ধারণা ভেঙে চুরমার করে শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথকে বাংলার নাট্যা মঞ্চ সফল নয়' এই দারণা ভেঙে চুর মার করে শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথকে বাংলার নাট্যামোদী মানুষের কাছে এনে দিলেন।' ধ্রুব গুপ্ত, বিশিষ্ট চিত্র ও নাট্য - সমালোচক তো বলেই ফেললেন, 'পথের পাঁচালীর পর সিনেমা খারাপ করা মুশকিল। রক্তকরবীর পর বাংলা নাটও আর খারাপ হতে পারে না।' শঙ্খ ঘোষের মতে, 'আমরা যে -রক্তকরবী পড়ি তা আজ অনেকাংশেই বহুরূপীর চোখে দেকা রক্তকরবী।' আর শম্ভু মিত্রের কাছে 'রক্তকরবী' তাঁর নাট্যভাষা অনুসন্ধানের একটা বিরাট অধ্যায়। এই নাটকই তাঁর অনুভূতি, উপলব্ধি বা প্রকাশভাষার ভারতীয়ত্ব'।

ইব্সেনের 'এ জল্স্ হাউস' অবলম্বনে ১৯৫৮-য় শম্ভু মিত্র করলেন 'পুতুলখেলা'। নারীর স্বাতন্ত্র্যসাধনায় আগ্রণী এই নাটক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদৃত। পুরুষ - শাসিত সমাজে পুরুষ দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি করা সামাজিক বিধিবিধানের দিকে আঙুল তুলেই এই নাটকের শেষ অঙ্কে বলু (নোরা) বলে, 'তাইতো এবার আমি চেষ্টা করবো বুঝতে যে কে ঠিক, আমি, না এই পৃথিবীর ব্যবস্থা? বহুরূপীর মঞ্চ সফল নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম এই নাটকের নোরা বা বুলুর ভূমিকায় অভিনয় করেন তৃপ্তি মিত্র ও তপনের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র।

রবীন্দ্রনাটক 'মুক্তধারা' প্রযোজনা করে বহুরূপী ১৯৫৯ সালে। ১৯৬১ সালে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের 'কাঞ্চ নরঙ্গ'। প্রসঙ্গত 'কাঞ্চ নরঙ্গ' নাটকের মূল চরিত্র পাঁচুর ওপর ভিত্তি করেই তিনি তৈরি করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বৈত চলচ্চিত্র 'জগতে রহো' (হিন্দি) এবং 'একদিন রাত্রে' (বাংলা)। ১৯৬১ সালেই আবার রবীন্দ্র - নাটক 'বিসর্জন'। আবার কেন রবীন্দ্রনাটক বা বিশেষ করে বিসর্জন? 'আজও পৃথিবীতে অজস্র রাজনৈতিক বেদীর সামনে আদর্শের নামে, ভবিষ্যতের নামে, ঐতিহ্যের নামে - ব্যক্তিগত মানুষের সুখ দুঃখ, তার আশা, তার ভালোবাসা, সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞায় ভুলুণ্ঠিত করে এক বিরাট নরমেধ যঞ্জের আয়োজন হচ্ছে। সমাচ্ছন্ন সেই ভয়ংকর বিসর্জন নাটকে বাঁচবার পথের একটা দিশা পাবো।' এই উক্তির মধ্য দিয়েই বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে বারবার তিনি এমন নাটকই নির্বাচন করেছেন যার মধ্য দিয়ে সমকালীন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ পরিস্ফুট হয়।

১৯৬৪-তে একই বছরে দুটি প্রযোজনা মঞ্চ স্থ হয়। একটি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', অন্যটি সোফোক্লেসের 'রাজা অয়দিপাউস'। প্রাচ্যের নাটকটি বিশুদ্ধ ব্যঞ্জ না ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অপরদিকে পাশ্চ াত্যের নাটকটি প্রত্যক্ষ ও বাহুল্যবর্জিত এবং পরিণতিতে দুঃসহবাবে নির্মম। দুটো নাটক দুটি ভিন্ন মেরুর। 'অয়দিপাউস'এ সংঘাত আছে, suspense আছে, tension আছে। অন্য দিকে 'রাজা'য় আছে সুকুমার কাব্যানুভব যা অনুভূতির সূক্ষ্ম স্নায়ুমুখকে জাগ্রত করে। দুটি নাটকের একটি খুবই অন্তঃমিল আছে। দুটি নাটকেই আলো - আঁধারির খেলা এমন অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় যেন 'অন্ধকার থেকে চতনার দিকে এক আলোক যাত্রা।

বহুরূপীর পরের দুটো নাটকের রচয়িতাই বাদল সরকার-'বাকি ইতিহাস' মঞ্চ স্থ হয় ১৯৬৭ সালে ও 'পাগলা ঘোড়া' ১৯৭১ সালে। পৃথিবী জুড়ে নানারকম ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকালাপ চলেছে অথচ আমরা মুখ গুঁজে নিজ নিজ গর্তে বেঁচে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করি। এই বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যকে প্রশ্ন করেই বাদল সরকার 'বাকি ইতিহাস'-এর ঘটনাপঞ্জী সাজান। আর 'পাগলা ঘোড়া' আমাদের অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করায়, যে-অতীতে নিজেদের দুর্বলতায় পাগলা ঘোড়ার কেশর চেপে ধরতে পারিনি। আর পারিনি বলেই হঠাৎ - আসা প্রেম মরীচিকাই থেকে গেছে। উল্লেখ্য এই দুটি নাটকেই শুধু নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন শম্ভু মিত্র, অভিনয়ে নয়।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় শেষ নাটক বিজয় তেণ্ডুলকারের মারাঠি নাটক 'শান্ততা, কোর্ট চালু আহে'র ভাষান্তর 'চোপ, আদালত চলছে'। এই মারাঠি নাটক অনাবাদ করেন এস. বি. যোশী ও নীতীশ সেন। আমাদের ভালোমানুষির আড়ালে গোপনে যে-হিংসা বয়ে বেড়াই, তার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন কারুর স্খলনের খবর পাই। আমাদের লুকিয়ে রাখা নাটকেও তিনি শুধুই নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন।

বহুরূপীর নিজস্ব প্রযোজনা ছাড়াও আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাটকে তিনি তরুণতর অভিনেতাদের নির্দেশনায় অভিনয় করেছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিদের্শনায় 'নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র প্রযোজনায় 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে 'চাণক্যে'র চরিত্রে অভিনয় করে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন নাট্যামোদী মহলে। সেই অভিনয়ের কথা স্মরণ করতে গিয়ে উমা সেনানবিশ বলেন, 'আজ্য আমার মনে হয় মুদ্রারাক্ষস নাটকে শুধু চাণক্যের চরিত্রটি যদি শম্ভুবাবু আর একবার করতেন। কি অপূর্ব আধুনিক ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছিলেন ওই চরিত্রের! এই সামাজিক অবস্থায় আজ মনে হয় কত বেশি জরুরি।'

এ ছাড়াও তিনি অভিনয় করেছিনেল শ্যামানন্দ জালানের নির্দেশনায় গিরীশ কারনাডের 'তুঘলক' নাটকে তুঘলক চরিত্রে ও বিখ্যাত জার্মান নির্দেশক ফ্রিৎস্ বেনেভিৎস্ পরিচালিত ব্রেখটের 'গালিলেওর জীবন' নাটকে গালিলেও চরিত্রে।

শুধুমাত্র বাংলা থিয়েটারই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক থিয়েটার, অন্যান্য ভাষার থিয়েটারের প্রসারেও শম্ভু মিত্রের প্রচুর অবদান রয়েছে। 'নবান্ন' এবং তৎপরবর্তী বহুরূপীর বিভিন্ন প্রযোজনা অন্যান্য অঞ্চ লের থিয়েটারকে বিভিন্নবাবে প্রভাবিত করেছিলো এবং সমৃদ্ধ করছিলো। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে দিল্লির ব্রাবোর্ন স্টে ডিয়ামে ১লা জানুয়ারী থেকে ৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে বহুরূপী পরিবেশন করে 'রক্তকরবী' ও 'পুতুলখেলা', এরপর ১৯৭১ সালে আবার বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে পরপর পাঁচ দিন মঞ্চ স্থ করে 'রাজা', 'পাগলা ঘোড়া', 'বাকি ইতিহাস', 'চার অধ্যায়', 'রাজা অয়দিপাউস',। ১৯৭৫ সালেও শম্ভু মিত্রের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আবার বোম্বাইয়ের প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে সংগঠিত হয় বহুরূপীর পাঁচটি নাটকের নাট্যোৎসব। বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত এইসব নাট্যোসবের মাধ্যমে বহুরূপীর নাট্যকীর্তির সাথে পরিচিত হয়েছেন অন্যান্য প্রদেশের থিয়েটার - কর্মীরা। গভীরবাবে প্রভাবিত, উদ্বুদ্ধ থিয়েটার কর্মীরা সগর্বে স্বীকারও করেছেন সেকথা।

মারাঠি মঞ্চে র প্রাণপুরুষ ও বিশিষ্ট অভিনেতা ডাঃ শ্রীরাম লাগু

'শম্ভু মিত্রের অসামান্য অবদান শুধু বাংলা নাটকেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বস্তুত ভারতীয় থিয়েটারে ওঁর প্রভাব ও অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা ভারতের প্রান্তে বসে শম্ভু

মিত্রের নামই শুধু শুনেছিলাম, ওঁদের নাটক দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল আই. এন. টি (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার)। পরে শম্ভুদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ৭২ কি ৭৩ সালে। থিয়েটার নিয়ে কথা বলার সময় শম্ভুদা অভিনয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন আপনি কি জানেন অ্যারিস্টটলের মতে একজন অভিনেতাকে অ্যাথলিট ফিলসকার হতে হবে? শুনে আমি যেন দিব্যজ্যোতি লাভ করেছিলাম। বুঝেছিলাম, অভিনেতার থাকতে হবে এক অ্যাথলিটের মত মজবুত অথচ নমনীয় শরীর যাতে অভিনয়ের দাবি অনুযায়ী উনি অক্লেশে নিখুঁত ভাবে তাঁর অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারেন আর জীবন জগৎ এবং মানুষের আচরণ সম্পর্কে তাঁর বোধ থাকতে হবে এক দার্শনিকের মতই গভীর। তৎক্ষণাৎ বুঝে গিয়েছিলাম অভিনেতা সম্পর্কে এই মহৎ সংজ্ঞার কতটা পেছনে পড়ে আছি। আরেকটি সুন্দর কথাও তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলাম - 'জানেন কি ডক্টর অভিনেতা হিসাবে আপ্নুনি নিজে এক যন্ত্র আর এই যন্ত্রের যন্ত্রীও আপনিই।' শম্ভুদার এই কথা দুটি না শুনতে পারলে আমি হয়তো এমন কষ্টসহিষ্ণু আর সুশৃঙ্খল অভিনেতা হয়ে উঠতে পারতাম না। ওঁর কাছ থেকে শেখা অভিনয় - দর্শনকে ভিত্তি করেই আমি গত ২০ বছর ধরে নিজেকে গড়েছি। যে অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা থিয়েটারের প্রতি আমার মনোভাব গড়ে দিয়েছেন তাঁর নাম শম্ভু মিত্র।'

মারাঠি থিয়েটারের বিশিষ্ট নির্দেশক ও অভিনেতা অমল পালেকর

'বলতে দ্বিধা নেই, মঞ্চে শম্ভুদার কাজ দেখেই প্রথম বুঝেছিলাম আর্ট ফর্ম হিসাব্দবে থিয়েটারের প্রকৃত শক্তি কোথায়। একথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করার কারণ নেই। বরং গর্বের সঙ্গেই স্বীকার করা ভাল যে বোম্বেতে শম্ভুদা ও তাঁর গোষ্ঠীর পারফরমেন্স আধুনিক মারাঠা থিয়েটারকে প্রভাবিত করেছে।'

প্রবীণ যোশী, গুজরাটি মঞ্চে র বিশিষ্ট পরিচালক

'ভারতীয় নাটকের আধুনিকতা আর ভাবধর্মী ভাঁল নাটক মানেই শম্ভু মিত্র।'

সবিতা যোশী, গুজরাটি মঞ্চে র শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী

'গুজরাটে অভিনেতারা শম্ভু মিত্রের অভিনয়শৈলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ওঁর বলার ঢং, ওঁর জেস্চার, মুভমেন্ট এমনকি কণ্ঠস্বরও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল।'

হিন্দি নাটকের বিশিষ্ট পরিচাল, 'অন্ধযুগ' এর নির্দেশক সত্যদেব দুবে

'আমি যখন শম্ভু মিত্রের 'পুতুলখেলা' নাটকটি দেদ্রখি তখন অ্যালবার্ট কামুর একটি রচনাকে ভিত্তি করে এক হিন্দি নাটকের রিহার্সালে ব্যস্ত ছিলাম। 'পুতুলখেলা' দেখার পরই বুঝেছিলাম রিয়ালিস্টিক কোরিওগ্রাফি নাটকে ঠিক কীরকম হওয়া উচিত। বলতে দ্বিধা নেই ওঁর সেই বাস্তবসম্মত কোরিওগ্রাফি আমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।'

কসমেপলিটান বোম্বাইয়ে ইংরাজি নাটক চর্চার পুরোধা 'এভিটা' 'এথেলো'র পন্দিরচালক এ্যালেক পদমসী

'বোম্বাইয়ে শম্ভু মিত্রর রাজা অয়দিপাউস দেখেছি, এই নাটকের পারফরমেন্স ছিল চমকে দেবার মত। দেখেছিলাম বোম্বাইয়ে আই. এন. টি.-র হয়ে ওঁর পরিচালনায় এ্যান এনিমি অফ দ্য পিপ্‌ল। আমার মতে, অভিনেতা হিসাবে শম্ভুদা লরেন্স অলিভিয়েরেরই সমকক্ষ, শম্ভুদার একাগ্রতা, নাটরে প্রতি ওঁর নিষ্ঠা ওঁর সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগে থেকেই ছিল আমার কাছে এক গভীর প্রেরণা।'

উপরোল্লিখিত অভিনেতা, অভিনেত্রী বা নির্দেশক, যাঁরা তাঁদের বাষার থিয়েটারে এক একটি প্রতিষ্ঠিত নামই শুধু নন, শৈল্পিক বিচারে অন্য প্রদেশে তথা বাংলায়ও বিশেষভাবে সমাদৃত, শম্ভু মিত্রের তিয়েটারকে ওঁদের ব্যক্তিগত প্রেরণার উৎস বলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এর ফলে অন্যান্য প্রাদেশিক থিয়েটারও বহুরূপী প্রযোজনা দ্বারা গভীরভাবে প্রবাবান্বিত হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্তানিস্লাভস্কি এবং ব্রেখ্‌ট্

বস্তুতপক্ষে নবনাট্য আন্দোলনের ঢেউয়ে তখন পাড়ি দিয়েছিলো বাংলা সহ সান্দরা ভারতের থিয়েটার। এবং এই নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা যে শম্ভু মিত্রই ছিলেন, একথা আপামর নাট্যামোদী দর্শক, নাট্যারসিন্সক সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। তবু এই অভিযোগ থেকেই গেছে তাঁর থিয়েটার 'গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই তা সর্বত্রগামী'। একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর নাট্যদর্শনের পিছনেস্তা নিস্লাভস্কির প্রভাব অবশ্যই ছিলো। তিনি বিশ্বাস করতেন স্তানিস্লাভস্কির দর্শনে

Our life is course and unclean.

It is a great happiness for a man if in the whole vast world he can find a house, a room or a square yard of space where, if only for a time, he can retreat form everyone and live by his finest feelings and implules. For the priest this clean place can be the altar and for the actor - the theatre and the stage.

The best thing that a man treasures in his heart must be taken there.

এই কথা শম্ভু মিত্র ব্যাখ্যা করেছেন, 'আমাদের কাছে মহলা দেবার জায়গা হোলো মন্দিরের মতো পবিত্র। মন্দিরে যাবার সময় মানুষ যেমন স্নান করে পরিস্কার কাপড় পড়ে যায়, আমাদেরও তেমনি শুচিত হয়ে আসা উচিত।

শুধু স্তানিস্লাভস্কির নাট্যদর্শনেই নয়, তাঁর বিশ্বাস ছিলো স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-রীতিতেও, তিনি অভিনয়েচ্ছু শিক্ষার্থীকে স্তানিস্লাভস্কির বই পড়তে পরামর্শ দিতেন। তাঁর মতে 'মঞ্চে র অভিনয়ে কিভাবে জীবন্ততা আসতে পারে তার ওপর স্তানিস্তাভস্কির বিশদভাবে লিখেছেন। এই জীবন্ততা প্রকাশ করতে পারলেই রিয়ালিটিকে ফোটানো যায়'। রিয়ালিস্টিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে স্তানিস্লাভস্কির জুড়ি নেই, এই মতবাদের সমর্থক থিয়েটারের বেশিরভাগ অভিনেতা অভিনেত্রীরা। তবু আমাদের দেশে থিয়েটার মহলে একটা ধারণা চালু আছে যে ব্রেখটীয় রীতিনীতি আর স্তানিস্লাভস্কির রীতিনীতির অবস্থান একেবারে ভিন্ন মেরুতে, শম্ভু মিত্রের থিয়েটার সম্পর্কে অভিযোগও এই ভাবনারই ফসল।

বলা হয় ব্রেখটের নাট্যসজ্জা নাকি সহজ সরল, নিরাভরণ। আচ শোনা যায়, কলকাতায় 'ব্রেখটের মঞ্চ াভিনয়ের দলিলচিত্র' বলে 'Mother Courage'-এর যে চলচ্ছবি দেখানো হয়, তাতে ফিল্মের রীতিনীত মেনেই সমস্ত দৃশ্যসজ্জা। শম্ভু মিত্রের মন্তব্য 'ফলে আমরা অনেকেই হতবুদ্ধি , কোন্‌টা ব্রেখটীয় ফর্ম এই ভেবে দিশেহারা হয়ে গেলুম।'

ব্রেখটীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে আরেকটা কথাও চালু আছে যে এই ফর্মের নাটকে সবসময় মঞ্চে সমান উজ্জ্বল আলো থাকবে। অর্থাৎ আলোর কোনো কারি - কুরি চলে না। কিন্তু সত্যটা হলো এই যে, ঠিক হৈরকম কঠোরভাবে নির্দেশিত কোনো বিধিনিষেধ ব্রেখট-এর নাটকে নেই। নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী আলোর সংখ্যা নির্ধারিত হয়। সেটা কখনো একটা স্পটেও হতে পারে আবার কখনো আলোর সূক্ষতা দেখানোও যেতে পারে। এর আগেকার নাটকে সবসময় আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করে একটা অবাস্তব অনৈসর্গিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রবণতা এসেছিলো। সেই ব্যাপারে একটা বাস্তবসম্মত শৈল্পিক রূপ দেবার জন্যই আলোর ব্যবহারে ওই বিধিনিষেধ।

এরপর আসা যাক সবচেয়ে বিতর্কিত বৈশিষ্ট্য - অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'Alienation From' এর প্রবক্তা ব্রেখট। এটা আত্যন্ত চালু কথা। কিন্তু শম্ভু মিত্রের মতে আমাদের থিয়েটারেও এই from আগে থেকেই ছিল। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে রাজা চোখ রাঙিয়ে ধনঞ্জয়কে শাসন, ধনঞ্জয় গান আরম্ভ করে। মঞ্চে র ওপর সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গান চলে, আমরা সকলেই এটাকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যবোধের অভাব বলে মনে করে এসেছি এতদিন। আজ পশ্চি ম থেকে ব্রেখট - এর নাটক এলো - তাতেও সেই কাণ্ড। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থিয়োরীও চলে এলো - Alienation। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলুম।'

ব্রেখট নিজেও বলেছেন, সমালোকেরা যদি আমার থিয়োরী না দেখে থিয়েটারটা দেখতে আসতো, তাহলে দেখতে পেতো যে এটা থিয়েটার - যে থিয়েটারে আশা করি কল্পনা আছে, রসিকতা আছে, এবং অর্থ আছে। আসলে ভালো অভিনয় মানে বালো অভিনয় তা সে জাপানের কাবুকি কি ব্রেখটের নিয়ম যেভাবেই হোকনা কেন।

তবুও ব্রেখটের থয়েটারের যে-ভঙ্গিটা, যেসব বৈশিষ্ট্য শম্ভু মিত্রকে মুগ্ধ করতো,, তা হলো 'বাস্তবকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিষ্টি মিষ্টি রূপ দেওয়া হয় না। কর্কশ ও কোমল, তথ্য ও কাব্য একত্রে মেলাবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ব্রেখটের, নাটকের গানগুলো এতো সহজ, এতো অন্তরঙ্গ সুরের অথচ সেই সহজতার মধ্যে গভীরতা আছে যা কাব্যমণ্ডিত

।।চলচ্চিত্র।।

নাট্য-নিবেদিত-প্রাণ শম্ভু মিত্রের চলচ্চিত্রাভিনয় বা নির্দেশনার জীবহ খুবই স্বল্পায়ু। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রাভিনয় 'এ টিনি থিং ব্রিংস ডেথ' নামক একটি ম্যালেরিয়া - সংক্রান্ত প্রচারচিত্রে। যে-ছবিতে অভিনয় তাঁর অভিনেতা -জীবনের অন্যতম 'মাইল ফলক' বলে চিহ্নিত, খাজ আহ্‌মেদ আব্বাস - পরিচালিত সেই ছবি 'ধরতিকে লাল'। গণনাট্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত এ ছিবিতে তিনি অভিনয় ছাড়াও সহ - নির্দেশনার দায়িত্বেও ছিলেন। এর পরেই অভিনয় করেন হেমেন গুপ্তের দুটি ছবিতে, 'অভিযাত্রী' ও '৪২'। স্বাধীনতা - সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হেমেন গুপ্তের অসাধারণ ছবি '৪২' - এও একটি ছোট চরিত্রে তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয় সবার নজর কেড়েছিলো। এই সময় তিনি মিরঞ্জন রায়ের তৈরি মর্মস্পর্শী অভিনয় সবান্দর

নজর কেড়েছিলো। এই সময় তিনি নিরঞ্জন রায়ের তৈরি একটি ছোট ছবি 'বোধোদয়'-এ অভিনয় করেন। তৎকালীন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র- পরিচালক দেবকীকুমার বসু তাঁর নিজেরই চিত্রনাট্যে চলচ্চিত্রায়িত করেন বহুরূপীর ইতিমধ্যে মঞ্চ স্থ নাটক তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক'। শুধু শম্ভু মিত্রই নয়, এই ছবিতে তাঁর সাথে অভিনয় করেন বহুরূপীর সদস্য - সদস্যারা। ঘটনাচক্রে এই ছবি চলাকালীন সময়েই দেবকী বসু সহ-পরিচালক অমিত মৈত্রের সাথে কাজের সূত্রে শম্ভু মিত্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। কালক্রমে এই ঘনিষ্ঠতা এমন জায়গায় পৌঁছোয় যে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে তৈরি করার। শুরু হলো চিত্রনাট্য লেখার কাজ বহু মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে 'কাঞ্চ নরঙ্গ'র 'পাঁচু' জাতীয় কোনো চরিত্রকে মডেল করে ছবি দৈরি হবে। আমাদের সমাজের তথাকথিত ভালো লোকেরা বা সমাজপতিরা কীভাবে একজন যথার্থ ভালো পোকের পিছনে লেগে তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে তাই হবে ছবির থীম। তৈরি হয়ে গেল এক রাত্রের মধ্যে চিত্রনাট্য। এর পরের সমস্যা অন্যত্র। চিত্রনাট্য তৈরি হলেও প্রযোজক পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে, বহু অসম্মানজনক অভিজ্ঞতার পর অমিত মৈত্র যখন প্রায় ভেঙে পড়েছেন ছবি তৈরির ব্যাপারে তখন শম্ভু মিত্রর ব্যক্তিগত বন্ধু বোম্বাইয়ের প্রেম ধাওয়ানের সূত্রে রাজকাপুরের কাছে যাওয়া এবং তারপরের ঘটনা সবই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তৈরি হলো R.K.Filma- এর ব্যানারে একমাত্র বাংলা ছবি 'একদিন রাত্রে' ও হিন্দিতে 'জাগতে রহো'। রাজকাপুরের অসাধারণ অভিনয়সমৃদ্ধ এই ছবি শুধু ব্যাবসায়িকভাবেই যে চরম সকল তাই নয়, ভালো ছবির স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৪৭ সালে কার্লোভি ভ্যারী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রাঁ. প্রি. পুরস্কার প্রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ, ১৯৫৮ সালে ওই একই পুরস্কার পায় সত্যজিৎ রায়ের 'অপারাজিত'। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবার পরেও ছবির জগতে সফল শম্ভু মিত্র কিন্তু সিনেমা অর বেশি করেন নি। আর যেকটি ছবি তিনি করেছিলেন তাহলো অমিত মৈত্রেয় সাথে যৌথ পরিচালনায় 'শুভবিবাহ', তারপর যথাক্রমে 'মানিক', 'কাঞ্চ নরঙ্গ' ও 'নতুনপাতা'।

একই প্রশ্ন আবারও মাথা চাড়া দেয়। চলচ্চিত্রের মতো আলোকোজ্জ্বল মাধ্যমে সফলতার সাথে বিচরণ করা সত্ত্বেও কেন তিনি সে জগৎ ছেড়ে এলেন ? যে - মাপের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েও তিনি চলচ্চিত্রের প্রতি মোহগ্রস্থ থাকতে পারলেন না, সেই মাপের বা তার থেঙ্গেক কমেও অনেক চলচ্চিত্র-পরিচালক তো বেশ স্বচ্ছন্দে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের ছবিতে অভিনয় করেও বহু তথাকথিত বামপন্থী বা প্রগতিশীল শিল্পী পরিশীলিত ছবিতে অভিনয় করেন বলে সগর্বে প্রচার করেন। কিন্তু শম্ভু মিত্র কেন তা করলেন না ?

''জাগতে রহো' করার ঠিক আগেই 'নবান্ন' করেছি, 'চার অধ্যায়' করেছি, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'ও করেছি। সেখান থেকে, সেই উচ্চ আদর্শ থেকে আমাকে চলচ্চিত্রের জন্য নেমে আসতেই হতো এমন বিষয়ের মধ্যে, যার জন্যে ডিস্ট্রিবিউটর টাকা দেবেন। আর টাকা আমাকে নিতে তো হতোই ছবি বানানোর জন্যে। তার মানে সুদসমেত লগ্নির টাকা ডিস্ট্রিবিউটরকে ফিরিয়ে দিতে আমি বাক্যবদ্ধ হয়ে যেতাম। তাহলে ওই ধাঁচের ছবি বানানোর সাহস দেখাতে পারতাম কি ? সুতরাং আমার মনে হয়েছিল দুঃসাহস যেটুকু যা দেখানোর তা আমার থিয়েটারেই দেখাবো।'

শম্ভু মিত্রের হয়তো মনে হয়নি, কিন্তু অনেক সফল নাট্যকর্মীর কাছে তাঁর নিজস্ব নাট্যপ্রয়াসের আসল উদ্দেশ্য অঢেল অর্থোপার্জন, তবে অবশ্যই তাঁর সৃষ্টি শিল্পের ওপর 'সুস্থ সামাজিক দায়বোধসম্পন্ন' নামাবলী চাপিয়ে। অক্লেশে তাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা হিন্দি চলচ্চিত্রে অর্থহীন ভাঁড়ামি বা ক্লিশে ভিলেনি করে যান বছরের পর বছর। আবার একই সাথে সৎ, সুস্থ সংস্কৃতির প্রচারে দীর্ঘ মিছিলেরনর পুরোভাগে শ্বেতশুভ্র পোশাকে কিম্বা প্রতিবাদী সমাবেশে গলার শিরা ফোলানো রক্ত গরম করা বক্তৃতায় অথবা উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তিরত অবস্থায় এঁদেরই দেখা যায় বারবার। তাঁরা ষাটের দেশকে যেভাবে গোলামকুদ্দুসের 'ইলা মিত্র' আবৃত্তি করতেন মাঠে ময়দানে, পরেও ট্যাবলো - সজ্জিত মহাসমাবেশে একই আবেগের পুনরাবৃত্তি করতেন ওই 'ইলা মিত্র'ই আবৃত্তি করার সময়। তখন বোঝাই যেতো না ওঁদের বিশ্বাসের কতটা বদল ঘটেছে বা আদৌ ঘটেছে কিনা ! অথচ শম্ভু মিত্রর কণ্ঠে 'মধুবংশীর গলি' এককালে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো, কিন্তু শেষের দিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজার অনুরোধেও সে কবিতা আর পড়েন নি। একান্ত আলাপচারিতায় জানিয়েছেন, 'ওই কবিতার বাণীতে আজ আর তাঁর আস্থা নিরঙ্কুশ নয়।' তাই জনগণের অনুরোধেও নিজস্ব রুচি পাল্টাতে রাজি হন নি। কারম ব্যক্তিজীবন থেকে শিল্পীজীবনকে পৃথক রাখার কুশলী পদ্ধতি তাঁর অধিগত ছিলো না বা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিলো না ওই দ্বিচারিতা।

ব্রাত্যের স্বপ্ন

'অনেক লোক, অনেক নাট্যসংস্থা। কিন্তু দৃষ্টি কি অনেক? সরস্বতীর বিভিন্ন মূর্তি কি ধ্যানে এসেছে বিভিন্ন লোকের? যারা সত্যিই সরস্বতীর সেবা করতে চায় তাদের আরো কাছাকাছি আসতে হবে। আরো একসঙ্গে কাজ করতে শিখতে হবে। আমাদের একত্র হওয়া দরকার সরস্বতী প্রতিষ্ঠার জন্য।'

কলকাতায় থিয়েটার - দর্শকের অভাব নেই। সেটা যেমন ব্যবসায়িক থিয়েটারের ক্ষেত্রে সত্য, প্তেমনি সত্য চেখভ বা ইব্ সেন বা রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখার ক্ষেত্রেও। আবার সমস্যা এই যে একই মঞ্চে দু'ধরনের দর্শকেরই মনোরঞ্জক থিয়েটার প্রদর্শনও সম্ভব নয়। সেই কারণেই প্রয়োজন এমন একটা পৃথক মঞ্চে র যেখানে দর্শক যেতে পারেন তাঁদের হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তির জন্য, যেখানে অভিনয় - শিল্পকে আরো গভীরভাবে অনুভব করা যায়, যেখানে সৃষ্টিশীল শিল্পীরা সত্যিই সুযোগ পাবেন নেশা আর পেশার মিল ঘটিয়ে তাঁঙ্গেদর শিল্পসাধনার মাধ্যমে সত্যসাধনা করতে এবং সর্বোপরি যেখানে শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যবসায়িক থিয়েটারের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হবে না। সেই কারণেই শম্ভু মিত্রের কাছে 'এই খেই - হারানো যুগের মধ্যে বসে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করাটা এতা জরুরী' বলে মনে হয়েছিলো। এই প্রয়োজনীয়তা শুধু তিনিই যে অনুভব করেছিলেন তা নয়। প্রথম 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এর ভাবনা ছিলো শিশির ভাদুড়ীর। শুধু তাই নয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে দার্জিলিং যাবার আগ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' গড়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুতে শিশির ভাদুড়ীর সে-স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে নি। শম্ভু মিত্র এই ভাবনায় সূত্র ধরেই উদ্যোগ নিলেন নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার। গঠিত হলো 'নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'। শিল্পের সাহিত্যের - সংস্কৃতির সমস্ত শাখার সন্নিবেশে এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলবার প্রয়াসের বাবনায় তাঁর সাথে শরিক হয়েছিলেন বাংলার শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক্‌পালরা - সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর, আলি আকবর, উদয়শঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, প্রদোষ দাশগুপ্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্যামানন্দ জালান, সবিতাব্রত দত্ত, গঙ্গাপদ বসু,, কুমার রায় প্রমুখ এবং প্রথমদিকে নান্দীকার, রূপকার ও বহুরূপী ও পরের দিকে অনামিকা, থিয়েটার গিল্ড, গান্ধার প্রমুখ নাট্যদল। বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা পশ্চি মবঙ্গ সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে এই বহুমুখী সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে তুললে একখণ্ড জমির জন্য আবেদন করেন। এখানে পরিস্কার করে উল্লেখ কথা ভালো এই জমি তাঁরা বিনামূল্যে চাননি, এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থমূল্য দিতেও প্রস্তুত আছেন এই মর্মেই তাঁরা আবেদন করেন। শুধু জমির জন্য আবেদন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। এই বিশাল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত করতে দরকার অনেক টাকা। তাই স্থির করা হয় সম্মেলক অভিনয় করে প্রাথমিকভাবে যত বেশি সম্ভব অর্থসংগ্রহের।

প্রথম প্রয়াসে অভিনীত হর 'রক্তকরবী' ১৯৬৯ সালের ৪টা মে। এরপর বিভিন্ন সময়ে অভিনয় হয় শ্যামানন্দ জালানের নির্দেশনায় 'তুঘলক' ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'মুদ্রারাক্ষস'। শুধু এই ভাবেই নয়, সাধারণ মানুষও এই কর্মকাণ্ডে সাগ্রহ স্বতস্ফূর্ততায় তাঁদের ভাঁড়ার উপুর করে সাহায্য করে ছিলেন। এর ফলে মাসমানেকের মধ্যেই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিলো। 'ব্রাত্যের স্বপ্ন' বাস্তবায়িত করার স্বপ্নে তখন মশগুল শম্ভু মিত্র। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। সেইসময় একবার মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁকে বললেন, 'জীবনে বহু জিনিস ভেঙে যেতে ধেখলুম, ভাঙার ইতিহাসেই অভিজ্ঞতা পূর্ণ। তাইতো ভাবি, তোমরা যে এতো উৎসাহে লেগেছো, এটা যদি ভাঙে তাহলে তোমরা কী করবে?' এই প্রশ্নে শম্ভু মিত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যান। তিনি বহু যুক্তি অবতারণা করেন মহর্ষিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এটা ভাঙতে পারে না। দেষে বলে ওঠেন, 'আসলে তো সমস্ত নির্ভর করছে আমাদের ওপর। আমরা যদি না ভেঙে যাই, তাহলে ভাঙবে কেন?' এইরকমই আস্থা ছিলো তাঁর নিজের এবং সাথীদের ওপর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্পকলার দ্বারাও লড়াই করা যায়। তাই 'অন্ধকারাবৃত সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটুখানি সততার দীপের মতো' তাঁদের এই স্বপ্নকে তাঁরা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। চাইলেই তো সব পাওয়া যায় না। সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা সব ক'টি শব্দকে একত্রিত করেও তাঁরা ঠেকে যাচ্ছিলেন কঠিনতম শেষ পর্যায়ে। বহু আশায় বুক বেঁধে দ্বিপাক্ষিক চূড়ান্ত আলোচনার জন্য কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে মেয়েরের কাছে 'নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে গেলে উদয়শঙ্কর, অজিতেশ, সবিতাব্রত, রুদ্রপ্রসাদ ও শম্ভু মিত্র। 'ধন্য আশা কুহকিনী!' ঘরে ঢুকে দেখেন আরও পাঁচ - সাত ভাগিদার উচ্চৈঃস্বরে দাবি জানিয়ে চলেছেন একখণ্ড জমির জন্য। অচিন্তনীয় এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে যান। উত্তেজিত শম্ভু মিত্র 'শকুন্ত' চিত্রকল্পটি ব্যবহার করেন। শুধু তিনিই নন, প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকেই এই ঘটনায় অপমানিত হয়ে মেয়েরের কাছে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এরপরেও প্রায় একই ঘটনা ঘটে যখন ১৯৭৫ সালে এমার্জেন্সীর সময় ত'কালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একদিন রাজ-ভবনে কলকাতার নাটকের লোকজনদের আমন্ত্রণ জানান। সেখানে নাটমঞ্চে র জমির প্রসঙ্গ উঠলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলে ওঠেন যে তাঁর জমি দেওয়ার ইচ্ছে আছে, তবে ভাগিদার অনেক। তৎক্ষণাৎ আত্মমর্যাদার মূর্ত প্রতীক শম্ভু মিত্র বলে ওঠেন, 'সিদ্ধার্থ, তুমি অনন্ত একজন কাউকে দাও। আমাদের পরস্পরকে লড়িয়ে দিও না।' শুধু তাই নয়, এই আচরণের প্রবিাদে সেই সভাও তিনি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন। জমি নিয়ে 'খুড়োর কল' - এর এই খেলায় তিনি আর মাততে চাইলেন না। স্বভাবতই জমিও আর পাওয়া গেলো না। সরকার বদল হলেও চিত্রের কোনো বদল হলো না। জমি কি কেউ পায়নি বা পায় না? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, অনেকেই বিবিধ উদ্দেশ্যে (অসৎ বলছি না) দরবার করেন বা করেছেন। তাঁদের কারুর ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। কিন্তু কেন নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার কারণে পাওয়া গেল না, সেই কারণ অনুসন্ধান আজ বৃথা। কেননা সমিতির বেশির ভাগ সদস্যই আজ আমাদের

ছেড়ে চলে গেছেন। তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ এই যে তখনও তো এ ব্যাপারে খুব বেশি প্রতিবাদ উত্থিত হয়নি এবং সব চাইতে আশ্চর্যের কথা তখন সেই আবেদনপত্রে সংস্কৃতির - সাহিত্যের - শিল্পের বহু দিকপালের স্বাক্ষর থাকলেও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল(!) বামপন্থী নাট্যকর্মী কিন্তু এই প্রয়াসের সাথে যুক্ত হন নি। কেন? তাঁরা কি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন যে আদতে এই প্রয়াস একটি ব্যর্থতার ইতিহাসে পরিণত হবে নাকি তাঁদের প্রখমর বাস্তববুদ্ধি বিরত করেছিলো এইরকম কোনো প্রয়াসের সাথে যুক্ত হতে, যেখানে শম্ভু মিত্রের ছায়ায় তাঁদের অস্তমিত হবার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু শম্ভু মিত্র? তিনি কি একটু অন্যপথে চলে পারতেন না তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে? ক্ষতি কী ছিলো কেননা ওখানে তো 'ছড়ি ঘোরাবার সুযোগ থাকতো তাঁরই'?

'একলা একটা মঞ্চ সংগ্রহ করে ফেলা আমাদের মধ্যে কিছু লোকের পক্ষে খুব একটা অসম্ভব ছিল না। সাপের গালে ও বেজির গালে একই সঙ্গে চুমু খেয়ে ব্যবসা কন্দের যাওয়াও আমাদের মধ্যে কিছু লোকের পক্ষে শক্ত ছিল না, যদি তাঁরা তা চাইতেন। চান নি। তাঁরা চেয়েছেন বুদ্ধি চালিত রুচিসম্মত নাটমঞ্চ সৃষ্টি হোক দেশে। সেটা যেমন ব্যবসাদার হবে না, তেমনি কোনো রাজনৈতিক দলেপ ভেঁপুদার হবে না। তেমনি আবার জীবনবিমুখ বিশুদ্ধ বিশ্লের ভড়ংও করবে না। সেটা সকল অর্থে সামাজিক হবে। গভীরভাবে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান সপন্ন।'

এইখানেই হিসাবে ভুল করে ফেলেছিলেন চাঁদ সদাগরের মতো। তাঁরই সৃষ্ট চাঁদতো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে তাঁর ভুল কোথায়-

'সমাজে, সংসারের আমাদের সবে অপবাদ দিবে, সব গালমন্দ দিবে কেননা তুমি যে যেটারে সত্য মনে করো সেটারে তুমি যে মন খুলে সত্য বলো। এইটাই অপরাধ।'

সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোক উজ্জ্বল, তাঁর নাট্যচেতনা, নাট্যবোধে সমৃদ্ধ স্বরচিত 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতে যে নাটক 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক', আছে অপরাধ এড়ানোর রাস্তা-

'জ্ঞানেরেও পূজা করো, ফির আবার অজানে ভজনা করো। সামনে নয়, গোপনে গোপনে করো, চুপিচুপি করো।' এই 'শৃগালের মতো খিড়কির দুয়ারের কাছে গিয়্যা ধুর্তামি' করতে চাঁদসদাগরও পারেন নি, পারেন নি তার স্রষ্টাও। তাতে 'ব্রাতের স্বপ্ন' বাস্তবায়িত হলো না। কিন্তু আমাদের কি ক্ষতি হলো? পরবর্তী কালের নাট্যশিশুক্ষুদের? যদি থাকতো একটা অভিনয় - শিক্ষণালয় যেখানে আলোকসম্পাত, মঞ্চ সজ্জা ও অভিনয় সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা যেতো তাহলে অবশ্যই এখানকার নাট্যপ্রয়োজনার মান উন্নত হবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হতো। বিভাস চক্রবর্তীর মতো প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিত্ব আক্ষেপ করেছেন, 'ওঁর নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির মধ্য দিয়ে যদি একটা নাট্যকেন্দ্র তৈরী করতে পারতেন তাহলে সেটি ভারতীয় নাট্যের একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতো। আজ এই জ্বলন্ত উদাহরণ চোখের সামনে না থাকাতে নাট্যকর্মীরা ক্রমশই কীরকম যেন লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াচ্ছেন।'

এই নাট্যমঞ্চে র ভাবনা কার্যত বাতিল হবার ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠলো, বিভিন্নভাবে সংগৃহীত টাকা পয়সার কী হবে। সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থদাতার কাছে চিঠি গেলো, জানতে চাওয়া হলো তিনি কী করতে চান। যিনি ফেরৎ চাইলেন তাঁকে সুদ সহ টাকা ফেরত দেওয়া হলো, আর বাকি টাকা সরোজ গুপ্তের ক্যান্সার হাসপাতাল, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে দান করা হলো। যে দেশে সরকারি কোষাগারের টাকার হিসেবতো দূরের কথা, লুঠ হয়ে যায় অক্লেশে। সেখানে বেসরকারি টাকার এমন পাই - পয়সার প্রত্যর্পণ? ভাবাই যায় না!

স্বপ্নের রূপোলি রেখা এরপরেও ছিলো, একটুখানি হলেও ছিলো, যখন কয়েকটি দল মিলে নাট্যকেন্দ্র স্থানপ করে, পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও আবার সেখানে অভিনয় করতে রাজি হন শম্ভু মিত্র একটাই কারণে - 'আমাকে ব্যবহার করে তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা তুলে তোমাদের ভবিষ্যৎ কাজের জন্য একটা জায়গা করে নাও। তোমরা যখন এই কাজ সম্পূর্ণ করবে তখনতো আমি বেঁচে থাকবেন্দ্বা না। সবটাই তোমাদের হবে।' টানা বাইশটি অভিনয় করে এই প্রযোজনায়। আবারও হতাশ! এবারও তাঁর ইপ্সিত সাফল্যের তীর ছুঁতে পারা গেলো না, হয়তো অধরাই থেকে গেলো।

নাটমঞ্চ তৈরীর এই ব্যর্থতা তাঁকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো। তাঁর এতদিনের লালিত স্বপ্নের এইভাবে সমাধি হবে এটা তিনি কিছুতেই মানতে চান নি। স্বপ্নভঙ্গে অভিমানী মনের কিছুটা ছোঁয়া পেয়েছিলাম এই মহাপ্রাণের সাথে সময় কা'টানোর সৌভাগ্যজনক এক অবসরে। কথায় কথায় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন কী করি আর নাটকের জন্যই বা কখন সময় দিই। আমার ুত্তর শুনে এককথায় বলে দিলেন 'হবে না'। আশাহত আমার মুখের ওপর পরিষ্কার ভাষায় বলে দেন, 'নেশা আর পেশা এক করতে না পারলে কিছুই হবেনা'। আমি বেন্দ্বাঝাবার চেষ্টা করি আমার যুক্তি, আমাদের অসহায়তা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোথ্যও বোধহয় এতো কষ্ট করপ্তেত হয় নি। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন অর্থোপার্জনের জাঁতাকলে পিষে আমাদের সব রস নিংড়ে নেওয়া হয়, সার্থক শিল্প সৃষ্টি করার পরিশ্রমের ক্ষমতাই থাকে না আর। তবু এর মধ্যেই যাঁরা চেষ্টা করেছেন তাঁদের জন্য গর্ববোধ করেন একথাও ব্যক্ত করেন। কথায় কথায় তাঁরা চোখের মণি দুটো যেন জ্বলজ্বল করছিলো। মনের গভীরে হয়তো তখনও ক্ষীণ আশার ক্ষীণতর রেখা। 'ধরো, তোমাকে এমন একটা কাজ দেওয়া গেলো যেখানে তুমি মেশাটাকে মেলাতে পারো পেশার সাথে, আর ধরো, টাকঅও কিছু পেলে। তাতে বিলাসিতা সম্ভব নয়, তবে গ্রাসাচ্ছাদন স্বচ্ছন্দে হতে পারে।' স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলা। যদি সত্যি হতো? আমাদের থিয়েটারি ভালোবাসার একটা সদর্থক রূপ দেওয়া যেতো, থিয়েটারের মানুষকে এতো বিভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে পড়তে হতো না! সমাজ যকন অন্ধকার কালীদহের রূপ নিচ্ছে, তখন থিয়েটার - ভেলার মধ্যে মঞ্চে র পিদিম জ্বেলে ভেলাটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে ভাসা যেতো। হয়তো একে অনেকে রোমান্টিসিজম বলে আখ্যা দিতে পারেন। তবু এটা যে তাহলে অনন্ত মানুষ হিসাবে আমাদের এতো শস্তা হয়ে যেতে হতো না।

'আদ্যোপান্ত নোটো লোক' শম্ভু মিত্র কিছুতেই মানতে পারেন নি নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের ব্যর্থতাকে। যুক্ত, পাল্ট া যুক্তি হয়তো অনেকেই খানা করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে 'যুক্তি দিয়ে তো বীর্যের প্রমাণ হয় না। আমাদের তবু পারা উচিত ছিলো একটা মঞ্চ তৈরী করতে'। মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত শম্ভু মিত্র নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সব ব্যাপারে থেকেই। ক্রমশ তাঁর মনে হতে লাগলো, 'দিনের প্রখর আলোকের কোলাহল ছড়িয়ে এক দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমরা একক। সেইখানে সেই রহস্যময় অন্ধকারের সঙ্গে আমাদের নিজের মত করে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়।' এই অন্ধকারের মহিমা রবীন্দ্রনাথ থেকে শম্ভু মিত্র প্রসারিত। আমাদের বোধের মধ্যে পরিস্কার নয় এ অিন্ধকারের স্বরূপ, তাই আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় েসকন প্রয়োজন হয় এই সম্পর্ক স্তাপনের। দেবেশ রায় ঠিকই বলেছেন, 'মহত্ত্বের সঙ্গে বসবাস করা কঠিন, অষ্টপ্রহর হীনমন্যতায় ভুগতে হয়।' যেকোনো বিষয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, নিজস্ব মত প্রকাশে স্পষ্টবক্তা, শৈল্পিক প্রশ্নে অনাপোষী, এই স্পর্ধিত বাঁচার মানসিক ঔদ্ধ ত্যসম্মন্ন মানুষকে মেনে নিতে পারার সহনশীলতা খুব্ব কম মানুষের মধ্যেই ছিলো।

সমকাল তাঁকে বিচার করতে ইতস্তত করেছে, দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে তাঁর মূল্যায়নে। শুদু নাট্যপ্রয়োজনার ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে নয়, তাঁর সময়ের থিয়েটারকে তিনি কতটা বদলেছেন, আজকের থিয়েটারকে এ চেহারায় আনতে তংার অবদান কতটা, আমাদের থিয়েটারি বোধ তৈরিতে তাঁর ভূমিকা - এসব নিয়ে স? বিশ্লেষণ নিশ্চ য়ই ভাবীকাল করবে। আসুন, আমরা খোলা মনে অনুভব করার চেষ্টা করি তাঁর শেষ ইচ্ছা, যেখানে ব্যক্ত হয়েছে আমাদের চেনা গণ্ডির বাইরে এক অসামান্য মানুষের সামান্যভাবে চলে যাবার অসাধারণ প্রত্যয়।

লেখাটি সাজাতে যেসব বই বা পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১। সন্মার্গ সপর্যা
২। কাকে বলে নাট্যকলা
৩। নাটক রক্তকরবী
৪। Konstantin Stanislavsky - Selected Works
৫। শম্ভু মিত্র শ্রদ্ধা ঞ্জলি - সংবাদ প্রতিদিন, সাহিত্য সংসদ, শিশু সাহিত্য সংসদ
৬। দেশ - শম্ভু মিত্র সংখ্যা
৭। আনন্দলোক - শম্ভু মিত্র সংখ্যা
৮। আলোকপাত - শম্ভু মিত্র সংখ্যা
৯। কথাকৃতি বিশেষ সংখ্যা - প্রসঙ্গ অজিতেশ